HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – বাংলাদেশের সংবিধান

টপিক – ০১ বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের ইতিহাস

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের ইতিহাস
টপিক ০২: বাংলাদেশের সংবিধানের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য
টপিক ০৩: রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি
টপিক ০৪: সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকারসমূহ
টপিক ০৫: বাংলাদেশ সংবিধান (প্রথম সংশোধন) আইন, ১৯৭৩
টপিক ০৬: বাংলাদেশ সংবিধান (দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংশোধন) আইন, ১৯৭৩
টপিক ০৭: বাংলাদেশ সংবিধান (চতুর্থ সংশোধন) আইন, ১৯৭৫
টপিক ০৮: বাংলাদেশ সংবিধান (পঞ্চম সংশোধন) আইন, ১৯৭৯
টপিক ০৯: বাংলাদেশ সংবিধান (ষষ্ঠ সংশোধন) আইন, ১৯৮১
টপিক ১০: বাংলাদেশ সংবিধান (সপ্তম সংশোধন) আইন, ১৯৮৬
টপিক ১১: বাংলাদেশ সংবিধান (অষ্টম সংশোধন) আইন, ১৯৮৮

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ১২: বাংলাদেশ সংবিধান (নবম সংশোধন) আইন, ১৯৮৯
টপিক ১৩: বাংলাদেশ সংবিধান (দশম সংশোধন) আইন, ১৯৯০
টপিক ১৪: বাংলাদেশ সংবিধান (একাদশ সংশোধন) আইন, ১৯৯১
টপিক ১৫: বাংলাদেশ সংবিধান (দ্বাদশ সংশোধন) আইন, ১৯৯১
টপিক ১৬: বাংলাদেশ সংবিধান (ত্রয়োদশ সংশোধন) আইন, ১৯৯৬
টপিক ১৭: বাংলাদেশ সংবিধান (চতুর্দশ সংশোধন) আইন, ২০০৪
টপিক ১৮: বাংলাদেশ সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১
টপিক ১৯: বাংলাদেশ সংবিধান (ষোড়শ সংশোধন) আইন, ২০১৪
টপিক ২০: এক নজরে বাংলাদেশ সংবিধানের সংশোধনীসমূহ
টপিক ২১: বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান
টপিক ২২: সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

টপিক ০১: বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের ইতিহাস

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের ইতিহাস

ক. পটভূমি: ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাদের চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের দিন। এদিন 'জয় বাংলা' শ্লোগানে মুখরিত মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মুখে বাংলাদেশ ও ভারতের মিত্রবাহিনীর নিকট রমনা রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহ্রাওয়ার্দী উদ্যান) প্রায় ৯৩ হাজার পাকিস্তানি সেনা আত্মসমর্পণ করার সাথে সাথেই বাংলাদেশ কার্যত স্বাধীন হয়। ২২ ডিসেম্বর মুজিবনগরস্থ স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার ঢাকায় এসে শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করেন। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিলের 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র' অনুযায়ী দেশ শাসিত হতে থাকে। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানি কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করে দেশে ফিরে আসেন। দেশে ফেরার পর তিনি কালবিলম্ব না করে সংবিধান প্রণয়নে মনোনিবেশ করেন। ১৯৭২ সালের ১১ জানুয়ারি রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 'অস্থায়ী সংবিধান আদেশ' জারি করেন। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিলের 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র' দ্বারা যে রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছিল, তার পরিবর্তে সংসদীয় সরকারব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়।

বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের ইতিহাস

খ. বাংলাদেশ অস্থায়ী সংবিধান আদেশ: ১১ জানুয়ারি, ১৯৭২

Provisional Constitution Order of Bangladesh: 11 Jan. 1972

"যেহেতু ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিলের স্বাধীনতা-ঘোষণাপত্র আদেশের মাধ্যমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের শাসন পরিচালনার জন্য অস্থায়ী বিধান প্রণয়ন করা হয়েছিল;

এবং যেহেতু উক্ত ঘোষণাপত্র রাষ্ট্রপ্রধানের সকল নির্বাহী ও আইন প্রণয়নগত ক্ষমতা এবং একজন প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছিল;

এবং যেহেতু উক্ত ঘোষণাপত্রে বর্ণিত অন্যায় ও বিশ্বাসঘাতকতামূলক যুদ্ধের অবসান বর্তমানে ঘটেছে;

এবং যেহেতু বাংলাদেশের জনগণের ঘোষিত আকাঙ্ক্ষা এই যে, বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র কার্যকরী করা হবে;

এবং যেহেতু উক্ত লক্ষ্য অনুযায়ী এক্ষেত্রে অবিলম্বে কতগুলো বিধান প্রণয়ন করা প্রয়োজন;

বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের ইতিহাস

সেহেতু এক্ষণে, রাষ্ট্রপতি অনুগ্রহপূর্বক ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিলের স্বাধীনতা ঘোষণাপত্র আদেশ এবং এতদুদ্দেশ্যে তাকে প্রদত্ত সকল ক্ষমতা অনুসারে নিম্নোক্ত আদেশ প্রণয়ন ও জারি করেছেন:

১. এ আদেশ বাংলাদেশ অস্থায়ী সংবিধান আদেশ, ১৯৭২ নামে অভিহিত হবে।

২. এটি সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হবে।

৩. এটি অবিলম্বে বলবৎ হবে।

৪. সংজ্ঞা: এ আদেশে বর্ণিত 'গণপরিষদ' বলতে ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর ও ১৯৭১ সালের জানুয়ারি এবং ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের আসনগুলোতে বিজয়ী এবং আইনের দ্বারা বা অধীনে অন্যদিক দিয়ে অযোগ্য বিবেচিত নন, বাংলাদেশের এমন সকল নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিকে নিয়ে গঠিত পরিষদকে বোঝাবে।

৫. বাংলাদেশে একটি মন্ত্রিপরিষদ থাকবে এবং প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিপরিষদের প্রধান থাকবেন।

৬. রাষ্ট্রপতি তার সকল দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করবেন।

৭. রাষ্ট্রপতি গণপরিষদে এমন একজন সদস্যকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করবেন, যিনি গণপরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থা ভোগ করেন। অন্য সকল মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবেন।

৮. গণপরিষদ কর্তৃক সংবিধান প্রণীত হওয়ার পূর্ববর্তী কোন সময়ে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হলে, মন্ত্রিপরিষদ বাংলাদেশের একজন নাগরিককে রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করবেন। তিনি গণপরিষদ কর্তৃক প্রণীত সংবিধান অনুসারে অপর একজন রাষ্ট্রপতি কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি পদে বহাল থাকবেন।

৯. বাংলাদেশের একটি হাইকোর্ট থাকবে। একজন প্রধান বিচারপতি ও সময়ে সময়ে নিযুক্ত হতে পারেন এমন অন্যান্য বিচারককে নিয়ে হাইকোর্ট গঠিত হবে।

১০. বাংলাদেশ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতির শপথ পাঠ পরিচালনা করবেন এবং রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী, অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রিগণের শপথ-পাঠ পরিচালনা করবেন। শপথ বাক্যের ফরম মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত হবে।”

শেখ মুজিবুর রহমান

রাষ্ট্রপতি,
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

ঢাকা
১১ জানুয়ারি, ১৯৭২

বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের ইতিহাস

গ. বাংলাদেশের সংবিধান রচনায় গণপরিষদের তৎপরতা ও সংবিধান প্রণয়ন

Working of the Constituent Assembly and Constitution making

একটি সংবিধান প্রণয়ন করে জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য ১৯৭২ সালের ২৩ মার্চ 'বাংলাদেশ গণপরিষদ আদেশ' জারি হয়।১ এ আদেশ ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে কার্যকর হবে বলে ঘোষণা করা হয়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচিত ৪৬৯ জন সদস্যদের মধ্যে (জাতীয় পরিষদের ১৬৯ + প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০ = ৪৬৯ জন) ৪০৩ জন সদস্য নিয়ে গণপরিষদ গঠিত হয়। কেননা ৪৬৯ জন সদস্যের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে নিহত হয়েছিলেন ১২ জন, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর দালালির অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিলেন ৫ জন, দুর্নীতির দায়ে আওয়ামী লীগ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন ৪৬ জন, পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করেছিলেন ২ জন (ভাষা আন্দোলনের খুনি নূরুল আমীন ও স্বতন্ত্র সদস্য রাজা ত্রিদিব রায়), পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চাকরি গ্রহণ করেছিলেন ১ জন। এ ৪০৩ জন গণপরিষদ সদস্যের মধ্যে ৪০০ জন ছিলেন আওয়ামী লীগ দলীয়, ১ জন ছিলেন ন্যাপ (মোঃ) এর এবং বাকি ২ জন ছিলেন নির্দলীয়।

বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের ইতিহাস

বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের ইতিহাস

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ১৯৭২ সালের ১০ এপ্রিল গণ-পরিষদের প্রথম অধিবেশন আহ্বান করেন। অধিবেশনের প্রথম দিনে গণ-পরিষদ সদস্যগণ কর্তৃক স্পিকার নির্বাচিত হন শাহ্ আব্দুল হামিদ ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হন জনাব মোহাম্মদ উল্লাহ্। ১১ এপ্রিল ড. কামাল হোসেনকে সভাপতি করে ৩৪ সদস্যবিশিষ্ট খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়।২ এ ৩৪ জনের মধ্যে ৩৩ জন ছিলেন আওয়ামী লীগ দলীয় গণপরিষদ সদস্য এবং ১ জন ন্যাপ (মোঃ) সদস্য শ্রী সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত। একজন মহিলা গণপরিষদ সদস্যকেও উক্ত কমিটির সদস্য করা হয়। এ খসড়া কমিটির প্রথম বৈঠক বসে ১৭ এপ্রিল ১৯৭২। এ বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংবিধান সম্বন্ধে জনমত আহ্বান করা হয়। খসড়া কমিটি সর্বমোট ৪৭টি বৈঠকে ৩০০ ঘণ্টা ব্যয় করে তাঁদের খসড়া চূড়ান্ত করে। ১৯৭২ সালের ১০ জুন কমিটি প্রাথমিক খসড়া প্রণয়ন করে। এরপর কমিটির সভাপতি ড. কামাল হোসেন ভারত ও যুক্তরাজ্যসহ বিভিন্ন দেশে গিয়ে সংবিধান-বেত্তাদের সাথে আলাপ-আলোচনা করে মূল্যবান অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। প্রস্তাবিত সংবিধানের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে ১৯৭২ সালের ১১ অক্টোবর কমিটির শেষ বৈঠকে খসড়া সংবিধানের চূড়ান্ত রূপ গৃহীত হয়।৩ ১৯৭২ সালের ১২ অক্টোবর গণ-পরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশন বসে। এ অধিবেশনে ড. কামাল হোসেন খসড়া সংবিধান বিল আকারে গণ-পরিষদে উত্থাপন করেন।

বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের ইতিহাস

১৯ অক্টোবর সংবিধানের ওপর ১ম পাঠ শুরু হয় এবং ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত চলে। এতে সর্বমোট ১০টি বৈঠকে ৩২ ঘণ্টা সময় ব্যয় হয়। অতঃপর ৩১ অক্টোবর ২য় পাঠ শুরু হয় এবং ৩ নভেম্বর পর্যন্ত তা চলে। ৪ নভেম্বর সংবিধানের ওপর ৩য় ও সর্বশেষ পাঠ শুরু হয়। ৪ মাত্র ২ ঘণ্টার মধ্যে এ কাজ শেষ হয় এবং বিপুল আনন্দ ধ্বনির মধ্যে বাংলাদেশ সংবিধান গণপরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয়। ১৯৭২ সালের ১৫ ডিসেম্বর সংবিধানের হস্তলিপি সংস্করণে গণপরিষদের সদস্যগণের স্বাক্ষর গৃহীত হয়। ৫ আইনমন্ত্রী ও খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটির প্রধান ড. কামাল হোসেন বলেন যে, 'এ সংবিধান বাঙালি জাতির স্বাধীন সত্তার অভিব্যক্তি।' জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু সংসদে বলেন যে, 'এ সংবিধান লিখিত হয়েছে লাখো শহীদের রক্তের অক্ষরে।' গণ-পরিষদ কর্তৃক গৃহীত এ সংবিধান বিজয় দিবসের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে কার্যকর করা হয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – বাংলাদেশের সংবিধান

টপিক – ০২ বাংলাদেশের সংবিধানের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

টপিক ০২: বাংলাদেশের সংবিধানের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বাংলাদেশের সংবিধানের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশ সংবিধানের বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ:

১. লিখিত সংবিধান: বাংলাদেশ সংবিধান লিখিত। ১৫৩টি অনুচ্ছেদবিশিষ্ট ৮২ পৃষ্ঠার এ সংবিধান ১১টি ভাগে বিভক্ত এবং এর একটি প্রস্তাবনাসহ ৭টি তফসিল রয়েছে।

২. দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান: বাংলাদেশের সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয়। সাধারণত সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে সংবিধানে প্রয়োজনীয় সংশোধনী প্রস্তাব পাস করানো যায়।

৩. রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি: বাংলাদেশ সংবিধানের 'দ্বিতীয় ভাগে' রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রের মূলনীতি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এই মূলনীতিগুলো আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য না হলেও এবং এগুলো আইনের মর্যাদা ভোগ না করলেও রাষ্ট্রের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ তাদের কার্যক্রম পরিচালনার সময় এসব মূলনীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত ও প্রভাবান্বিত হবেন।

৪. মৌলিক অধিকার: এ সংবিধানে জনগণের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সংবিধান দেশের সর্বোচ্চ আইন। সুতরাং সংবিধানে মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ করায় এগুলোর গুরুত্বও বৃদ্ধি পায়। জীবনধারণের অধিকার, চলাফেরার অধিকার, বাকস্বাধীনতার অধিকার, চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা, ধর্ম চর্চার অধিকার, সম্পত্তির অধিকার ইত্যাদি মৌলিক অধিকার সংবিধানে স্বীকৃত হয়।

বাংলাদেশের সংবিধানের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

৫. এককেন্দ্রিক শাসন: সংবিধানে বাংলাদেশকে একটি এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারই সব ক্ষমতার অধিকারী। কেন্দ্রীয় আইনসভাই সার্বভৌম আইন প্রণয়নকারী সংস্থা।

৬. প্রজাতন্ত্র: বাংলাদেশ একটি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র। রাষ্ট্রপতি হবেন রাষ্ট্রপ্রধান। তার নামে রাষ্ট্রের শাসন কাজ পরিচালিত হবে। রাষ্ট্রপ্রধান জাতীয় সংসদ সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন।

৭. সংবিধানের প্রাধান্য: সংবিধান রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন। সংবিধানে 'অনুচ্ছেদ ৭'-এ বলা হয়েছে যে, "প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ; এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে। জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোনো আইন যদি এই সংবিধানের সাথে অসামঞ্জস্য হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতটুকু অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততটুকু বাতিল হইবে।"

বাংলাদেশের সংবিধানের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

৮. সংবিধান বাতিল, স্থগিতকরণ, ইত্যাদি অপরাধ: সংবিধানের 'অনুচ্ছেদ ৭ক'-তে বলা হয়েছে যে,
"(১) কোন ব্যক্তি শক্তি প্রদর্শন বা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বা অন্য কোন অসাংবিধানিক পন্থায়-
(ক) এই সংবিধান বা ইহার কোন অনুচ্ছেদ রদ, রহিত বা বাতিল বা স্থগিত করিলে কিংবা উহা করিবার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ বা ষড়যন্ত্র করিলে; কিংবা
(খ) এই সংবিধান বা ইহার কোন বিধানের প্রতি নাগরিকের আস্থা, বিশ্বাস বা প্রত্যয় পরাহত করিলে কিংবা উহা করিবার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ বা ষড়যন্ত্র করিলে-
তাহার এই কার্য রাষ্ট্রদ্রোহিতা হইবে এবং ঐ ব্যক্তি রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে দোষী হইবে।
(২) কোন ব্যক্তি (১) দফায় বর্ণিত-
(ক) কোন কার্য করিতে সহযোগিতা বা উস্কানি প্রদান করিলে; কিংবা
(খ) কার্য অনুমোদন, মার্জনা, সমর্থন বা অনুসমর্থন করিলে-
তাহার এইরূপ কার্যও একই অপরাধ হইবে।
(৩) এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত অপরাধে দোষী ব্যক্তি প্রচলিত আইনে অন্যান্য অপরাধের জন্য নির্ধারিত দণ্ডের মধ্যে সর্বোচ্চ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।"

বাংলাদেশের সংবিধানের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

৯. সংবিধানের মৌলিক বিধানাবলি সংশোধন অযোগ্য: সংবিধানের 'অনুচ্ছেদ ৭খ'-তে বলা হয়েছে যে, "সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সংবিধানের প্রস্তাবনা, প্রথম ভাগের সকল অনুচ্ছেদ, দ্বিতীয় ভাগের সকল অনুচ্ছেদ, নবম-ক ভাগে বর্ণিত অনুচ্ছেদসমূহের বিধানাবলি সাপেক্ষে তৃতীয় ভাগের সকল অনুচ্ছেদ এবং একাদশ ভাগের ১৫০ অনুচ্ছেদসহ সংবিধানের অন্যান্য মৌলিক কাঠামো সংক্রান্ত অনুচ্ছেদসমূহের বিধানাবলি সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন, রহিতকরণ কিংবা অন্য কোন পন্থায় সংশোধনের অযোগ্য হইবে"।

১০. সংসদীয় গণতন্ত্র : বাংলাদেশ সংবিধানে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভার হাতে দেশের শাসনকার্য পরিচালনার ভার অর্পণ করা হয়। জাতীয় সংসদ সমস্ত ক্ষমতার উৎস। মন্ত্রিসভার সদস্যগণ একক এবং যৌথভাবে জাতীয় সংসদের নিকট দায়ী। প্রধানমন্ত্রীর নিয়োগ ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপ্রধান প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শমত কাজ করেন।

১১. ন্যায়পাল : সংবিধানে 'ন্যায়পালে'র (Ombudsman) পদ সৃষ্টি করা হয়। সংবিধানে বলা হয় যে, "সংসদ আইনের মাধ্যমে ন্যায়পাল সৃষ্টি করবেন। ন্যায়পাল সুপ্রিম কোর্টের একজন বিচারকের মতো ক্ষমতার অধিকারী হবেন। তিনি বাংলাদেশ সরকারের যেকোন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ শুনবেন ও প্রয়োজনে দণ্ডাজ্ঞা দিতে পারবেন এবং যে-কোন কর্তৃপক্ষকে তাঁর নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য করতে পারবেন।"

বাংলাদেশের সংবিধানের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

১২. সর্বজনীন ভোটাধিকার: সংবিধানে সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার প্রদান করা হয়। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেে ১৮ বছর বয়স্ক যেকোন নাগরিক ভোটাধিকার লাভ করেন।

১৩. মালিকানার নীতি: বাংলাদেশ সংবিধানে তিন ধরনের মালিকানার কথা বলা হয়েছে-রাষ্ট্রীয়, সমবায় ও ব্যক্তিগত সমবায় ও ব্যক্তিগত মালিকানা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকবে।

১৪. জনগণের সার্বভৌমত্ব: সংবিধানে বলা হয়েছে যে, "জনগণই সকল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার উৎস। জনগণ প্রত্যক্ষভাবে ন প্রতিনিধি নির্বাচনের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পরিচালনা করবে।"

১৫. এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভা: বাংলাদেশ সংবিধানে এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভার ব্যবস্থা করা হয়। আইনসভার না 'জাতীয় সংসদ'। ১৯৭২ সালে প্রণীত মূল সংবিধানে বলা হয়েছিল যে, ৩০০ জন নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং তাদের দ্বারা ১ বছরের জন্য নির্বাচিত ১৫ জন মহিলা সদস্য নিয়ে (মোট ৩১৫ জন) জাতীয় সংসদ গঠিত হবে। ২০১১ সালে সংবিধানে পঞ্চদশ সংশোধন আইন প্রণয়নের পর জাতীয় সংসদের আসন সংখ্যা হলো প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত তিনশত সদস এবং জাতীয় সংসদ সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত পঞ্চাশ জন মহিলা সদস্য।

বাংলাদেশের সংবিধানের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

১৬. অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার: বাংলাদেশের সংবিধানে 'সমাজতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার কথা বলা হলে 'শ্রেণীসংগ্রাম' বা 'বিপ্লবের' কথা স্বীকার করা হয়নি। বাংলাদেশ সংবিধানে সংসদীয় গণতন্ত্রের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কল - ঘোষণা করা হয়। তবে জাতীয় সংসদ প্রয়োজনবোধে ব্যক্তিগত সম্পত্তি জাতীয়করণ করতে পারবে বলে বিধান করা হয়।

১৭. দলীয় শৃঙ্খলা : দলীয় শৃঙ্খলা রক্ষায় এ সংবিধান কঠোর দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে। কোন সংসদ সদস্য নিজের দল ত্যাগ করলে বা সংসদে উক্ত দলের বিরুদ্ধে ভোট প্রদান করলে সংসদে তাঁর আসন শূন্য হবে বলে বিধান করা হয়।

১৮. বিচার বিভাগ: বাংলাদেশের বিচার সংক্রান্ত দায়িত্ব বিচার বিভাগের ওপর ন্যস্ত থাকবে। বিচার বিভাগের শীর্ষে থাকবে সুপ্রিম কোর্ট। আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট গঠিত হবে। এছাড়াও জেলায় জেলা জজের অধীনে বিচারকার্য চলবে। রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগ দান করবেন। প্রধান বিচারপতির সাথে পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি অন্যান্য বিচারকগণকে নিয়োগ দান করবেন। বিচার বিভাগের কর্মকর্তাদের নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব সুপ্রিম কোর্টের ওপর ন্যস্ত থাকবে।

বাংলাদেশের সংবিধানের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

১৯. প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল: সাধারণ বিচার বিভাগ ছাড়াও সংবিধানে ন্যায়পীঠ বা প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল গঠনের ব্যবস্থা করা হয়। সরকারি কর্মকর্তা ও রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তাদের বিভিন্ন কার্যক্রম এর এখতিয়ারভুক্ত।

২০. রাষ্ট্র ভাষা: সংবিধানে বলা হয় যে, প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা হলো বাংলা।

বাংলাদেশের সংবিধানের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

২১. জাতীয় সঙ্গীত, পতাকা ও প্রতীক: বাংলাদেশ সংবিধানের 'অনুচ্ছেদ ৪'-এ বলা হয়েছে যে,

'(১) প্রজাতন্ত্রের জাতীয় সঙ্গীত "আমার সোনার বাংলা"র প্রথম দশ চরণ।

(২) প্রজাতন্ত্রের জাতীয় পতাকা হইতেছে সবুজ ক্ষেত্রের উপর স্থাপিত রক্তবর্ণের একটি ভরাট বৃত্ত।

(৩) প্রজাতন্ত্রের জাতীয় প্রতীক হইতেছে উভয় পার্শ্বে ধান্যশীর্ষবেষ্টিত, পানিতে ভাসমান জাতীয় পুষ্প শাপলা, তাহার শীর্ষদেশে পাটগাছের তিনটি পরস্পরসংযুক্ত পত্র, তাহার উভয় পার্শ্বে দুইটি করিয়া তারকা।

(৪) উপরিউক্ত দফাসমূহ সাপেক্ষে জাতীয় সঙ্গীত, পতাকা ও প্রতীক সম্পর্কিত বিধানাবলি আইনের দ্বারা নির্ধারিত হবে'।

২২. রাজধানী: সংবিধানের 'অনুচ্ছেদ ৫'-এ বলা হয়েছে যে,

(১) প্রজাতন্ত্রের রাজধানী ঢাকা।

(২) রাজধানীর সীমানা আইনের দ্বারা নির্ধারিত হবে।

২৩. নাগরিকত্ব: সংবিধানের 'অনুচ্ছেদ ৬'-এ বলা হয়েছে যে,

'(১) বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইনের দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হবে।

(২) বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসেবে বাঙালী এবং নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলিয়া পরিচিত হইবেন'।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – বাংলাদেশের সংবিধান

টপিক – ০৩ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি

টপিক ০৩: রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি

১৯৭২ সালে প্রণীত বাংলাদেশ সংবিধানের প্রস্তাবনায় রাষ্ট্র পরিচালনার ৪টি মূলনীতির কথা বলা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে-১. জাতীয়তাবাদ, ২. সমাজতন্ত্র, ৩. গণতন্ত্র এবং ৪. ধর্মনিরপেক্ষতা।

ক. রাষ্ট্রীয় মূলনীতিসমূহ

আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হচ্ছে কল্যাণকামী রাষ্ট্র। জনগণের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক দিকের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধন করাই কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের অন্যতম লক্ষ্য। এ উদ্দেশ্যে ভারত, আয়ারল্যান্ড প্রভৃতি দেশের সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য কতগুলো মৌলিক নীতি নির্ধারণ করা হয়েছে। এ নীতিগুলো হচ্ছে রাষ্ট্র শাসনের মূলসূত্র। সরকারের কর্তব্য হলো রাষ্ট্রীয় জীবনের সবক্ষেত্রে এগুলোকে প্রয়োগ করা। অনুরূপভাবে বাংলাদেশের সংবিধানের ২য় ভাগে

রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি

'রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি' শিরোনামে ৮ হতে ২৫ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত কতগুলো রাষ্ট্রীয় মূলনীতি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। নিম্নে এগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

১. জাতীয়তাবাদ : অভিন্ন ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে একই ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যে লালিত বাঙালি জাতি ভাষা আন্দোলনের সময় থেকে নিজেদেরকে পাকিস্তানি জনগোষ্ঠী হতে পৃথক মনে করতে শুরু করে। বাঙালি জনগণ ঐক্যবদ্ধভাবে মুক্তি সংগ্রামের মহান চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করে। তাই বাংলাদেশ সংবিধানের '৯ম অনুচ্ছেদে' বলা হয়েছে- "ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত একক সত্তাবিশিষ্ট যে বাঙালি জাতি ঐক্যবদ্ধ ও সংকল্পবদ্ধ সংগ্রাম করে জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করিয়াছেন, সেই বাঙালি জাতির ঐক্য ও সংহতি হইবে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি।" বাঙালি জাতির ঐক্য ও সংহতির মূলে রয়েছে ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির অভিন্নতা। বাঙালিরা একটি স্বতন্ত্র জাতি।

রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি

২. সমাজতন্ত্র ও শোষণ মুক্তি: সংবিধানের 'অনুচ্ছেদ ১০'-এ বলা হয়েছে যে, 'মানুষের উপর মানুষের শোষণ হইতে মুক্ত ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজলাভ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হইবে'। সমাজজীবন হতে সর্বপ্রকার শোষণের অবসান করে শোষণমুক্ত ন্যায়ানুগ সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সকলের জন্য সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হবে রাষ্ট্রের অন্যতম মূলনীতি। এ উদ্দেশ্যে উৎপাদন যন্ত্র, উৎপাদনের উপকরণ ও বণ্টন ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় ন্যস্ত করা হবে। তবে আইনের দ্বারা আরোপিত সীমার মধ্যে ব্যক্তিগত মালিকানা থাকবে। কিন্তু সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে গণতান্ত্রিক পথে। এজন্য শ্রেণীসংগ্রাম বা বিপ্লবের প্রয়োজন নেই।

রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি

৩. গণতন্ত্র ও মানবাধিকার: গণতন্ত্রের প্রতি অদম্য স্পৃহাই বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতা সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করেছিল। তাই সংবিধানে গণতন্ত্রকে রাষ্ট্রের অন্যতম মূল স্তম্ভ হিসেবে ঘোষণা করা হয়। সংবিধানের '১১নং অনুচ্ছেদে' বলা হয়েছে, "প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে।" প্রাপ্ত বয়স্কদের সর্বজনীন ভোটাধিকারের মাধ্যমে সরকার নির্বাচিত হবে। সমাজজীবন হতে সর্বপ্রকার বৈষম্য দূরীভূত করে নাগরিকদের মৌলিক মানবিক অধিকার এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধান করা হবে।

রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি

৪. ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা: ১৯৭২ সালে প্রণীত মূল সংবিধানের ১২নং অনুচ্ছেদে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলা হয়েছিল। মূল সংবিধানে বলা হয়েছিল যে, বাংলাদেশে কোনো বিশেষ ধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হবে না। জনগণের পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা থাকবে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ধর্মের অপব্যবহার বিলোপ করা হবে। প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজস্ব পছন্দ অনুযায়ী ধর্ম পালন, চর্চা ও প্রচার করতে পারবে। কোনো বিশেষ ধর্মাবলম্বী ব্যক্তির প্রতি বিশেষ সুযোগ-সুবিধা বা তার প্রতি কোন বৈষম্যমূলক আচরণ করা হবে না। ২০১১ সালে প্রণীত সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী আইনে বলা হয়েছে যে,

'ধর্ম নিরপেক্ষতা নীতি বাস্তবায়নের জন্য

(ক) সর্ব প্রকার সাম্প্রদায়িকতা,

(খ) রাষ্ট্র কর্তৃক কোন ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা দান,

(গ) রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মীয় অপব্যবহার,

(ঘ) কোন বিশেষ ধর্ম পালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য বা তাহার উপর নিপীড়ন, বিলোপ করা হইবে'।

রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি

খ. অন্যান্য রাষ্ট্রীয় মূলনীতি

বাংলাদেশ সংবিধানে উপরোল্লিখিত চারটি নীতিকে রাষ্ট্রীয় মূল স্তম্ভ বলা হয়। তবে এ নীতিসমূহ হতে উৎসারিত অন্য নীতিগুলোও রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে পরিগণিত হয়। এগুলো হলো:

১. মালিকানার নীতি : উৎপাদন যন্ত্র, উৎপাদন ব্যবস্থা ও বণ্টন প্রণালিসমূহের মালিক বা নিয়ন্ত্রক হবেন জনগণ এবং এ উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রে তিন প্রকার মালিকানা থাকবে। যথা: (১) রাষ্ট্রীয় মালিকানা অর্থাৎ অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান প্রধান ক্ষেত্রগুলোর সমন্বয়ে গতিশীল রাষ্ট্রীয় ও সরকারি খাত সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণের পক্ষে রাষ্ট্রের মালিকানা, (২) সমবায়ী মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা আরোপিত বাধানিষেধ সাপেক্ষে নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে সমবায়সমূহের সদস্যদের পক্ষে সমবায়ী মালিকানা ও (৩) ব্যক্তিগত মালিকানা অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে ব্যক্তির মালিকানা।

২. কৃষক ও শ্রমিকের মুক্তি: কৃষক, শ্রমিক তথা সকল অনগ্রসর শ্রেণিকে সব রকম শোষণ হতে মুক্ত করা হবে রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব।

৩. মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা: পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের উন্নতি সাধন করা হবে রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব। এ উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র জনগণের (ক) জীবনধারণের জন্য অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা করবে। (খ) কর্মের অধিকার ও যুক্তিসঙ্গত মজুরির বিনিময়ে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা বিধান করবে, (গ) যুক্তিসঙ্গত বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশের ব্যবস্থা করবে এবং (ঘ) বেকারত্ব, ব্যাধি, পঙ্গুত্ব কিংবা যে কোনো পরিস্থিতিতে সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে।

৪. গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি বিপ্লব : কৃষি বিপ্লব, পল্লী অঞ্চলে বৈদ্যুতিকীকরণ, বিভিন্নমুখী শিল্পের বিকাশ, শিক্ষার প্রসার ও যোগাযোগ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন করে শহর ও গ্রামীণ জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৫. অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা: নিরক্ষরতা দূর করার লক্ষ্যে এবং সমাজের প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সমগ্র দেশে একই প্রকৃতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত শিক্ষা ব্যবস্থাকে সকল বালক-বালিকার জন্য বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করা হবে।

রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি

৬. জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা: জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন ও জনগণের পুষ্টির স্তর উন্নয়ন করা রাষ্ট্রের অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য। এ উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র আইনের দ্বারা নির্ধারিত অন্যবিধ প্রয়োজন ব্যতীত মদ ও অন্যান্য মাদকদ্রব্য এবং স্বাস্থ্যহানিকর ভেষজের ব্যবহার নিষিদ্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। জুয়াখেলা ও গণিকাবৃত্তি নিষিদ্ধ ঘোষণা ও নিরোধের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৭. পরিবেশ ও জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন: রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করবে এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীব-বৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করবে।

৮. সুযোগের সমতা: মানুষে মানুষে সকল প্রকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীভূত করে সম্পদের সুষম বণ্টনের মাধ্যমে সকলের জন্য সমান সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের অন্যতম কর্তব্য। সংবিধানের 'অনুচ্ছেদ ১৯'-এ বলা হয়েছে যে,

'(১) সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবেন।

(২) মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ-সুবিধাদান নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৩) জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবেন।'

রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি

৯. অধিকার ও কর্তব্যরূপে কর্ম: কর্ম হচ্ছে কর্মক্ষম নাগরিকের পক্ষে অধিকার, কর্তব্য ও সম্মানের বিষয়। প্রত্যেকের নিকট হতে যোগ্যতানুসারে ও প্রত্যেককে কর্মানুযায়ী এই নীতির ভিত্তিতে পারিশ্রমিক প্রদান করা হবে। কোন ব্যক্তি যাতে অনুপার্জিত আয় ভোগে সমর্থ না হয় সেদিকে রাষ্ট্রের সজাগ দৃষ্টি থাকবে। রাষ্ট্র সকল প্রকার সৃষ্টিধর্মী ও বুদ্ধি-বৃত্তিমূলক শ্রমকে উৎসাহিত করে ব্যক্তিত্বের পূর্ণতর বিকাশে সহায়তা করবে।

১০. নাগরিক ও সরকারি কর্মচারীদের কর্তব্য: প্রত্যেক নাগরিক এবং প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত সকল কর্মচারীর কর্তব্য হচ্ছে রাষ্ট্রের সংবিধান ও আইন মান্য করা, শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা, যথাযথভাবে নাগরিক দায়িত্ব পালন করা, জাতীয় সম্পত্তির সুষ্ঠু ব্যবহার ও অপচয় রোধ করা এবং জনগণের সেবায় সর্বদা নিজেকে নিয়োজিত রাখা।

রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি

১১. নির্বাহী বিভাগ হতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ: জনগণের স্বাধীনতা রক্ষার্থে বিচার বিভাগ যাতে সকল প্রকার নিয়ন্ত্রণমুক্ত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ রায় ঘোষণা করতে পারে সেজন্য 'রাষ্ট্রের নির্বাহী আইনসমূহ হইতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবেন'।

১২. জাতীয় সংস্কৃতি: রাষ্ট্র জনগণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার সংরক্ষণে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। জাতীয় ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পকলার উন্নয়ন ও বিকাশে রাষ্ট্র কার্যকর ভূমিকা পালন করবে যেন সর্বস্তরের জনগণ জাতীয় সমৃদ্ধিতে অবদান রাখার এবং অংশগ্রহণের সুযোগ পায়।

১৩. উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি: রাষ্ট্র বিভিন্ন উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১৪. জাতীয় স্মৃতি নিদর্শন সংরক্ষণ: সংবিধানে বলা হয়েছে যে, "বিশেষ শৈল্পিক কিংবা ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন বা তাৎপর্যমণ্ডিত স্মৃতিনিদর্শন, বস্তু বা স্থানসমূহকে বিকৃতি, বিনাশ বা অপসারণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।"

রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি

১৫. আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও সংহতির উন্নয়ন: আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ভূমিকা হবে 'জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও সমতার প্রতি শ্রদ্ধা, অন্যান্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা, আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান এবং আন্তর্জাতিক আইনের ও জাতিসংঘের সনদে বর্ণিত নীতিসমূহের প্রতি শ্রদ্ধাপোষণ। এসব নীতির ভিত্তিতে বাংলাদেশ বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শক্তি প্রয়োগ পরিহার ও নিরস্ত্রীকরণের জন্য চেষ্টা চালাবে, প্রত্যেক জাতির নিজস্ব পছন্দ অনুযায়ী জীবন পদ্ধতি নির্ধারণের অধিকারকে সমর্থন করবে এবং সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশিকতাবাদ ও বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে নিপীড়িত মানুষের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামকে সমর্থন করবে'।

রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি

গ. রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহের তাৎপর্য ও গুরুত্ব

বাংলাদেশ সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহের সন্নিবেশন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সংবিধানের ৮(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, "এ নীতিগুলো রাষ্ট্র পরিচালনার মূলসূত্র হবে, আইন প্রণয়নকালে রাষ্ট্র এগুলো প্রয়োগ করবে, সংবিধান ও অন্যান্য আইনের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে নির্দেশক হবে এবং রাষ্ট্র ও নাগরিকের কার্যের ভিত্তি হবে।" রাষ্ট্রীয় মূলনীতিগুলো আইন নয় এবং আদালতের মাধ্যমে বলবৎযোগ্য হবে না। এসব মূলনীতির কোনো শাসনতান্ত্রিক আইনের মর্যাদা না থাকলেও জনগণের সার্বিক কল্যাণ সাধনের জন্য এর গুরুত্ব অপরিসীম। শাসন কর্তৃপক্ষ এসব নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য আইনত দায়ী না থাকলেও ক্ষমতায় নিজস্ব অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার তাগিদে এগুলো উপেক্ষা করতে পারেন না। কেননা, গণতান্ত্রিক সরকারের ভিত্তিই হচ্ছে জনগণের আস্থা। মূলনীতিগুলো বাস্তবায়নে সরকার গড়িমসি করলে জনসমর্থন হারাবে এবং নির্বাচনি বৈতরণী পার হয়ে পুনরায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে পারবে না।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – বাংলাদেশের সংবিধান

টপিক – ০৪ সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকারসমূহ

টপিক ০৪: সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকারসমূহ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকারসমূহ

বাংলাদেশ সংবিধানের তৃতীয় ভাগে ২৬ অনুচ্ছেদ থেকে ৪৭ (ক) অনুচ্ছেদ পর্যন্ত মৌলিক অধিকারগুলো লিপিবদ্ধ রয়েছে। সংবিধানের "তৃতীয় ভাগের" "২৬ অনুচ্ছেদে'' 'মৌলিক অধিকারের সাথে অসামঞ্জস্য আইনকে বাতিল ঘোষণার কথা বলা হয়েছে। ২৬ (১)-এ বলা হয়েছে যে, 'এই ভাগের বিধানাবলির সাথে অসামঞ্জস্য সকল প্রচলিত আইন যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, এই সংবিধান প্রবর্তন হতে সে সকল আইনের ততখানি বাতিল হয়ে যাবে'।

২৬(২)-এ বলা হয়েছে যে, 'রাষ্ট্র এই ভাগের কোনো বিধানের সাথে অসামঞ্জস্য কোনো আইন প্রণয়ন করবে না এবং অনুরূপ কোনো আইন প্রণীত হলে তা' এই ভাগের কোনো বিধানের সাথে যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হয়ে যাবে। এছাড়া ২৬(৩)-এ বলা হয়েছে যে, 'সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদের অধীনে প্রণীত সংশোধনের ক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদের কোনো কিছুই প্রযোজ্য হবে না'। সংবিধানে উল্লিখিত মৌলিক অধিকারসমূহ নিম্নরূপ :

১. আইনের দৃষ্টিতে সমতা: সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।

সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকারসমূহ

২. ধর্ম প্রভৃতি কারণে বৈষম্যহীনতা: কেবল ধর্ম, বর্ণ, নারীপুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করবে না। জনগণের কোনো বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোনো নাগরিককে কোনোরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাবে না। তবে রাষ্ট্র নারী, শিশু বা অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন করতে পারবে। রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষ সমান অধিকার লাভ করবে।

৩. সরকারি নিয়োগ লাভে সুযোগের সমতা: প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকবে। কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ বা জন্মস্থানের কারণে নাগরিকদের প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগের সুযোগের সমতার ক্ষেত্রে বৈষম্য প্রদর্শন করা যাবে না।

৪. উপাধি, সম্মান ও ভূষণের বিলোপসাধন: রাষ্ট্রপতির পূর্ব-অনুমোদন ব্যতীত কোনো নাগরিক বিদেশি রাষ্ট্রের নিকট থেকে কোনো খেতাব, সম্মান, পুরস্কার বা ভূষণ গ্রহণ করবে না। তবে সাহসিকতার জন্য পুরস্কার বা একাডেমিক পুরস্কার গ্রহণের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হবে না।

সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকারসমূহ

৫. আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার: আইনের আশ্রয় লাভ করার অধিকার বাংলাদেশের সকল নাগরিকের এবং সাময়িকভাবে বাংলাদেশে অবস্থানরত অপরাপর ব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য অধিকার। এজন্য আইনানুযায়ী ব্যতীত কোনো ব্যক্তির
জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির হানি ঘটে এরূপ কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না।

৬. জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার রক্ষণ আইনানুযায়ী ব্যতীত জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতা হতে কোনো ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাবে না।

৭. গ্রেপ্তার ও আটক সম্পর্কে রক্ষাকবচ: গ্রেপ্তারকৃত কোনো ব্যক্তিকে যথাসম্ভব শীঘ্র গ্রেপ্তারের কারণ জ্ঞাপন না করে প্রহরায় আটক রাখা যাবে না। কোনো ব্যক্তিকে তার মনোনীত আইনজীবীর সাথে পরামর্শ ও তার দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার হতে বঞ্চিত করা যাবে না। গ্রেপ্তারকৃত ও প্রহরায় আটক প্রত্যেক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে হাজির করা হবে এবং আদালতের আদেশ ব্যতীত তাকে উক্ত সময়ের অধিককাল আটক রাখা যাবে না। তবে কোনো বিদেশি শত্রুর ক্ষেত্রে এবং নিবর্তনমূলক আইনে গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তির ক্ষেত্রে উপরোক্ত কোনো কিছুই প্রযোজ্য হবে না।

৮. জবরদস্তি শ্রম নিষিদ্ধকরণ: সকল প্রকার জবরদস্তি শ্রম নিষিদ্ধ এবং এ বিধান কোনোভাবে লঙ্ঘিত হলে তা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হবে। তবে ফৌজদারি অপরাধের জন্য দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হবে না।

সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকারসমূহ

১২. সংগঠনের স্বাধীনতা: জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার স্বার্থে এবং আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে সমিতি বা সংঘ গঠন করার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকবে। তবে শর্ত থাকে যে, কোনো ব্যক্তির উক্তরূপ সমিতি বা সংঘ গঠন করবার কিংবা এর সদস্য হবার অধিকার থাকবে না, যদি-

ক. তা নাগরিকদের মধ্যে ধর্মীয়, সামাজিক এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়;

খ. তা ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ, জন্মস্থান বা ভাষার ক্ষেত্রে নাগরিকদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়;

গ. তা রাষ্ট্র বা নাগরিকদের বিরুদ্ধে কিংবা অন্য কোনো দেশের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী বা জঙ্গি কাজ পরিচালনার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়; বা

ঘ. এর গঠন ও উদ্দেশ্য এ সংবিধানের পরিপন্থী হয়।

সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকারসমূহ

১৩. চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাকস্বাধীনতা: (ক) চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়।

(খ) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশি রাষ্ট্রসমূহের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, শালীনতা বা নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা আদালত অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা সম্পর্কে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ সাপেক্ষে-

১. প্রত্যেক নাগরিকের বাক্ ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা থাকবে এবং

২. সংবাদপত্রের স্বাধীনতা থাকবে।

সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকারসমূহ

১৪. পেশা বা বৃত্তির স্বাধীনতা: আইনের দ্বারা আরোপিত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের যেকোনো পেশা বা বৃত্তি গ্রহণের এবং যে কোনো আইনসঙ্গত কারবার বা ব্যবসায় পরিচালনার অধিকার থাকবে।

১৫. ধর্মীয় স্বাধীনতা: আইন, জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতা সাপেক্ষে-

ক. প্রত্যেক নাগরিকের যে কোনো ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের অধিকার থাকবে।

খ. প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায় ও উপ-সম্প্রদায়ের নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের স্থাপন, রক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার অধিকার থাকবে।

কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এক ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিকে অন্য ধর্মীয় শিক্ষাগ্রহণে বাধ্য করা কিংবা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগদানে বাধ্য করা যাবে না। ১৬. সম্পত্তির অধিকার: আইনের দ্বারা আরোপিত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের সম্পত্তি অর্জন, ধারণ,

হস্তান্তর ও অন্যভাবে বিধি-ব্যবস্থা করার অধিকার থাকবে। আইনের কর্তৃত্ব ব্যতীত কোনো সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্ত বা দখল করা যাবে না।

সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকারসমূহ

১৭. গৃহ ও যোগাযোগের গোপনীয়তা রক্ষণ: রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা, জনগণের নৈতিকতা বা জনস্বাস্থ্যের প্রতি হুমকি সৃষ্টি না করলে কোনো নাগরিকের গৃহে বলপূর্বক প্রবেশ, তল্লাশি ও আটক করা যাবে না। এছাড়াও প্রত্যেক নাগরিক তার চিঠিপত্রের ও যোগাযোগের অন্যান্য উপায়ের গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার লাভ করবে।

১৮. মৌলিক অধিকার বলবৎকরণ: মৌলিক অধিকারসমূহ বলবৎ করার জন্য সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুযায়ী হাইকোর্ট বিভাগের নিকট মামলা রুজু করার অধিকার নিশ্চিত করা হলো।

১৯. শৃঙ্খলামূলক আইনের ক্ষেত্রে অধিকারের পরিবর্তন: কোনো শৃঙ্খলাবাহিনীর সদস্য-সম্পর্কিত কোনো শৃঙ্খলামূলক আইন উক্ত সদস্যদের যথাযথ কর্তব্যপালন বা উক্ত বাহিনীতে শৃঙ্খলা রক্ষা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে প্রণীত যেকোনো বিধানের ক্ষেত্রে মৌলিক অধিকারগুলো প্রযোজ্য হবে না।

২০. দায়মুক্তি বিধানের ক্ষমতা: প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি বা জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের প্রয়োজনে কোনো ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে কোনো কিছু করে থাকলে জাতীয় সংসদ আইনের দ্বারা সেই ব্যক্তিকে দায়মুক্ত করতে পারবে।

সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকারসমূহ

বাংলাদেশ সংবিধান সংশোধণ পদ্ধতি

প্রত্যেক দেশের সংবিধানে এর সংশোধনের বিধান থাকে। বাংলাদেশের সংবিধানও এর ব্যতিক্রম নয়। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৪২ নং অনুচ্ছেদে সংশোধনের নিয়মাবলি বিস্তারিতভাবে লিখিত আছে।

বাংলাদেশ সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয়। একে সাধারণ আইন প্রণয়ন পদ্ধতিতে সংশোধন করা যায় না, বরং বিশেষ পদ্ধতির মাধ্যমেই সংশোধন করা যায়। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে ১৪২ অনুচ্ছেদের প্রতিস্থাপন করে বলা হয়েছে যে, জাতীয় সংসদ সংবিধানের যে কোনো বিধানকে সংশোধন করতে পারে। তবে এজন্য দুটি শর্ত পালন করতে হবে।

প্রথমত, সংবিধান-সংশোধনের কোনো বিলই সংসদের বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা হবে না, যদি না উক্ত বিলের শিরোনামে সংবিধানের কোন্ বিধান সংশোধন করা হবে তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ না থাকে।

দ্বিতীয়ত, সংবিধান সংশোধনের বিল সংসদের মোট সদস্যের অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত হতে হবে। এভাবে কোনো বিল গৃহীত হলে সেই বিল রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য তার নিকট পেশ করা হবে। এরূপে সংসদে গৃহীত কোনো সংবিধান সংশোধনী বিল যখন রাষ্ট্রপতির নিকট পাঠান হয় তখন তিনি সাত দিনের মধ্যে বিলটিতে সম্মতি দান করবেন। তিনি তা করতে অসমর্থ হলে উক্ত সময় অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি বিলটিতে সম্মতি দান করেছেন বলে গণ্য হবে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – বাংলাদেশের সংবিধান

টপিক – ০৫ বাংলাদেশ সংবিধান (প্রথম সংশোধন) আইন, ১৯৭৩

টপিক ০৫: বাংলাদেশ সংবিধান (প্রথম সংশোধন) আইন, ১৯৭৩

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

বাংলাদেশ সংবিধান (প্রথম সংশোধন) আইন, ১৯৭৩

১৯৭৩ সালের ১২ জুলাই তৎকালীন আইনমন্ত্রী মনোরঞ্জন ধর কর্তৃক বাংলাদেশ সংবিধানের প্রথম সংশোধনী আইনের খসড়া বিল জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হয়। ১৫ জুলাই তা জাতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত হয় এবং ঐদিনই রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদিত হয়।৮ ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন গণহত্যা এবং যুদ্ধ অপরাধে লিপ্ত পাকিস্তানি সৈন্যসহ তাদের সহযোগী এদেশীয় অন্যান্যের বিচারের জন্য এ সংশোধনী আইন প্রণীত হয়। সংবিধানের এ সংশোধনের ফলে ৪৭ অনুচ্ছেদের (২) দফার পর নিম্নরূপ নতুন দফা যুক্ত হয়: "এ সংবিধানে যা বলা হয়েছে তা সত্ত্বেও গণহত্যাজনিত অপরাধ, মানবতা বিরোধী অপরাধ বা যুদ্ধাপরাধ এবং আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে অন্যান্য অপরাধের জন্য কোনো সশস্ত্র বাহিনী বা প্রতিরক্ষা বাহিনী বা সহায়ক বাহিনীর সদস্য কিংবা যুদ্ধবন্দীকে আটক, ফৌজদারিতে সোপর্দ কিংবা দণ্ডদান করার বিধান সম্মিলিত কোনো আইন বা আইনের বিধান এ সংবিধানের কোনো বিধানের সাথে অসামঞ্জস্য বা তার পরিপন্থী এ কারণে বাতিল বা বেআইনি বলে গণ্য হবে না।" সংবিধানের এ সংশোধনীর ফলে ১৯৭১ সালের যুদ্ধ অপরাধ এবং গণহত্যাজনিত কারণে আইন প্রণয়নসহ বিচার করার পথে অসুবিধা দূর হয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – বাংলাদেশের সংবিধান

টপিক – ০৬ বাংলাদেশ সংবিধান (দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংশোধন) আইন, ১৯৭৩

টপিক ০৬: বাংলাদেশ সংবিধান (দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংশোধন) আইন, ১৯৭৩

This Topic is important for

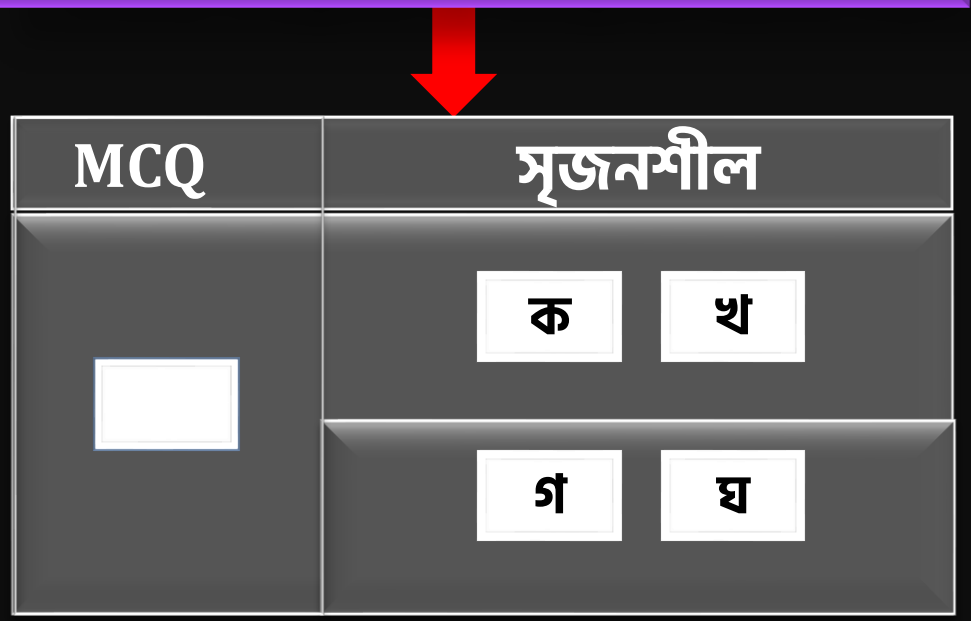

বাংলাদেশ সংবিধান (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন, ১৯৭৩

১৯৭৩ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর তৎকালীন আইনমন্ত্রী মনোরঞ্জন ধর সংবিধান সংশোধন বিল জাতীয় সংসদে উত্থাপন করেন। ২০ সেপ্টেম্বর তা জাতীয় সংসদ কর্তৃক পাস হয় এবং ২২ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদিত হয়ে সংবিধানের 'দ্বিতীয় সংশোধন' আইনে পরিণত হয়। দ্বিতীয় সংশোধনী দ্বারা মূল সংবিধানের কয়েকটি ধারা সংশোধন ও সংযোজন করা হয়।

প্রথমত, এ সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতিকে জরুরি অবস্থা ঘোষণার ক্ষমতা প্রদান করা হয়। পূর্বে জরুরি অবস্থা ঘোষণার কোনো বিধান ছিল না। সংবিধানের ১৪২-ক নং অনুচ্ছেদে জরুরি বিধানাবলিতে বলা হয় যে, যুদ্ধ বা বহিরাক্রমণ বা অভ্যন্তরীণ গোলযোগের দ্বারা বাংলাদেশ বা এর কোনো অংশের বা অর্থনৈতিক জীবন বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে রাষ্ট্রপতি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারবেন। এ জরুরি অবস্থা ঘোষণা পরবর্তী ঘোষণার দ্বারা প্রত্যাহার করা হবে এবং সংসদে উপস্থাপিত হবে এবং ১২০ দিন অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে সংসদ দ্বারা অনুমোদিত না হলে তা কার্যকর থাকবে না।

বাংলাদেশ সংবিধান (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন, ১৯৭৩

দ্বিতীয়ত, সংবিধানের ২৬ ও ২৪ ধারা সংশোধন করে বলা হয় যে, সংবিধান সংশোধন করার ফলে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হলে সংবিধানের ২৬ ধারা মোতাবেক উক্ত সংশোধনীকে অবৈধ বলে গণ্য করা যাবে না।

তৃতীয়ত, সংবিধানের ৩৩নং অনুচ্ছেদের সংশোধন করে বলা হয় যে, কোনো কারণ না দর্শায়ে যেকোনো ব্যক্তিকে যেকোনো সময়ে গ্রেপ্তার বা বিনা বিচারে আটক রাখা যাবে।

চতুর্থত, সংবিধানের ৭২নং অনুচ্ছেদের সংশোধন করে বলা হয় যে, সংসদের দুটি অধিবেশনের মাঝে বিরতির সময়সীমা হবে ১২০ দিন। পূর্বে এ সময়সীমা ছিল ৬০ দিন।

THANK YOU

বাংলাদেশ সংবিধান (তৃতীয় সংশোধন) আইন, ১৯৭৩

১৯৭৪ সালের ১৬ মে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং প্রজাতান্ত্রিক ভারত সরকারের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর মধ্যে উভয় দেশের সীমানা চিহ্নিতকরণ চুক্তি সম্পাদিত হয়।১০ এ চুক্তি দ্বারা মীজোরাম- বাংলাদেশ, ত্রিপুরা- সিলেট, ভাগলপুর রেলওয়ে লাইন, শিবপুর- গৌরাঙগালা, মুহরী নদী এলাকা (বেলোনিয়া), ত্রিপুরা-নোয়াখালি/কুমিল্লা সেক্টর, ফেনী নদী সীমান্ত, ত্রিপুরা-পার্বত্য চট্টগ্রাম সেক্টর, বিয়ানীবাজার-করিমগঞ্জ সেক্টর, হাকার খাল, বৈকারী খাল, হিলি, বেরুবাড়ি, লাঠিটিলা, ডুমাবাড়ি এলাকার সীমানা চিহ্নিতকরণ করা হয়।

সরকারের পক্ষে প্রধানমন্ত্রীদ্বয়ের সম্পাদিত চুক্তি বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত হয় ১৯৭৪ সালের ২৮ নভেম্বর। এর ফলে সংবিধান সংশোধন করতে হয়। সংবিধানের এ সংশোধনী 'তৃতীয় সংশোধনী' নামে পরিচিত।

এ সংশোধনীতে বলা হয় যে, চুক্তি অনুসারে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যবর্তী ভূ-সীমানা নির্ধারণের পর সরকারি গেজেটে বিজ্ঞপ্তি দ্বারা সরকার যে তারিখ বর্ণনা করেন সে তারিখ হতে উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত 'অন্তর্ভুক্ত এলাকা' বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার অংশ হবে এবং 'বহির্ভূত এলাকা' এর অংশ হবে না।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – বাংলাদেশের সংবিধান

টপিক – ০৭ বাংলাদেশ সংবিধান (চতুর্থ সংশোধন) আইন, ১৯৭৫

টপিক ০৭: বাংলাদেশ সংবিধান (চতুর্থ সংশোধন) আইন, ১৯৭৫

This Topic is important for

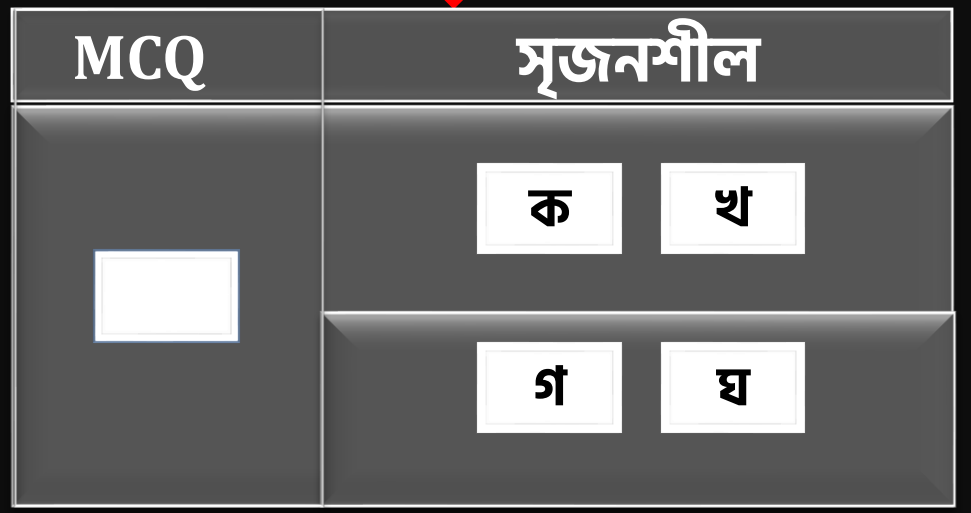

বাংলাদেশ সংবিধান (চতুর্থ সংশোধন) আইন, ১৯৭৫

১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি শনিবার জাতীয় সংসদে বাংলাদেশ সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী আইনের খসড়া তৎকালীন আইনমন্ত্রী মনোরঞ্জন ধর কর্তৃক উত্থাপন করা হয়। ঐ দিনই তা জাতীয় সংসদে গৃহীত হয়ে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদিত হয়ে আইনে পরিণত হয়।

ক. বাংলাদেশ সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী প্রবর্তনের কারণ বা পটভূমি: যে সকল কারণে আওয়ামী লীগ সরকার চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশে একদলীয় সমাজতান্ত্রিক শাসন প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল তা ছিল নিম্নরূপ:

১. সংসদীয় ঐতিহ্যের অভাব: বাংলাদেশের তৎকালীন অনেক বিরোধী দল সংসদীয় রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিল না। বেশ কিছু দল সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাসী ছিল। অস্থির রাজনীতি, বিশৃঙ্খল ও গুপ্ত রাজনৈতিক হত্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে।

২. অর্থনৈতিক সংকট: বিশ্বব্যাপী মুদ্রাস্ফীতি, অধিক মূল্যে বিদেশ থেকে দ্রব্য আমদানি, বাংলাদেশের রপ্তানিযোগ্য পণ্যাদির উপযুক্ত মূল্য লাভে ব্যর্থতা প্রভৃতি কারণে বাংলাদেশের অর্থনীতি মারাত্মকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। এছাড়া প্রলয়ঙ্করী বন্যাও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটায়। এরূপ সংকটময় পরিস্থিতিতেও একশ্রেণির মানুষ ঘুষ, দুর্নীতি, মুনাফাখোরী, মজুতদারি, কালোবাজারি ও চোরাচালানিতে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

৩. সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ দমন: বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর অনেক রাজনৈতিক দল, উপদল বা গোষ্ঠী নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক পদ্ধতি পরিহার করে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের উদ্যোগ গ্রহণ করে। "তারা পুলিশ ফাঁড়ি আক্রমণ, অস্ত্র, ব্যাংক ও ধনী জোতদারদের খামার লুণ্ঠন এবং শ্রেণিশত্রু খতম তথা রাজনৈতিক হত্যার কর্মসূচি গ্রহণ করে। “

৪. স্বাধীনতা বিরোধীদের ষড়যন্ত্র: ১৯৭১ সালে এদেশের কিছুসংখ্যক মানুষ স্বাধীনতাযুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে বরং এর বিরোধিতা করেছিল। তারা শুধু পাকিস্তানি বাহিনীকে সহযোগিতাই প্রদান করেনি বরং তারা বাংলাদেশের খ্যাতনামা ডাক্তার, অধ্যাপক, সাংবাদিক ও অন্যান্য বুদ্ধিজীবীদেরকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। স্বাধীনতার পরও তারা কলকারখানা, রাস্তাঘাট প্রভৃতি ধ্বংস করে দিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সরকারের ভাবমূর্তি বিনষ্ট করতে শুরু করে।

৫. আন্তর্জাতিক চক্রান্ত: ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি সামরিক সরকারকে যেসব বিদেশি রাষ্ট্র মদদ জুগিয়েছিল তারা বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরও বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করে। বাংলাদেশের অনেক রাজনৈতিক দলই এ সময় এসব বিদেশি শক্তির ইঙ্গিতে নিজেদের রাজনৈতিক কার্যকলাপ পরিচালনা করতে থাকে। এসব দলের মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সরকারকে উৎখাত করা।

বাংলাদেশ সংবিধান (চতুর্থ সংশোধন) আইন, ১৯৭৫

৬. সোভিয়েতপন্থিদের প্রভাব: সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাপ (মোঃ) এবং আওয়ামী লীগের একাংশ চীনাপন্থিদের উগ্র কার্যকলাপে ভীত ও বীতশ্রদ্ধ হয়ে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ নেতাগণকে সোভিয়েত ইউনিয়নের অনুকরণে একদলীয় শাসন প্রবর্তন করতে উদ্বুদ্ধ করেন।

৭. আওয়ামী লীগের মধ্যে মতভেদ ও কোন্দল: চতুর্থ সংশোধনী প্রণয়নের জন্য আওয়ামী লীগের মধ্যে সৃষ্ট মতভেদ ও কোন্দলও দায়ী ছিল।

৮. শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার সংকল্প: প্রথমে খরা ও অনাবৃষ্টি, পরে অতিবৃষ্টি এবং সর্বশেষে প্রলয়ঙ্করী বন্যার ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতি বিধ্বস্ত হয়ে যায় এবং দুর্ভিক্ষের কালো ছায়া গোটা জাতিকে গ্রাস করতে থাকে। এরূপ অবস্থায় সমাজকে শোষণমুক্ত করার উদ্দেশ্যে একটি শক্তিশালী ও উপযুক্ত প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলার প্রয়োজন অনুভব করা হয়।

খ. চতুর্থ সংশোধনীর প্রধান প্রধান ধারা বা বৈশিষ্ট্যসমূহ: বাংলাদেশ সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ :

১. রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন: চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। দেশের প্রকৃত শাসন ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত করা হয়। তিনি শুধু রাষ্ট্রপ্রধানই নন, সরকারপ্রধানও বটে। তিনি সরকার ও রাষ্ট্রের কর্ণধার। তিনি নামসর্বস্ব রাষ্ট্র প্রধান নন, বরং প্রকৃত ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্রপ্রধান।

২. অনুগত মন্ত্রিসভা: রাষ্ট্রপতি নিজের খেয়াল খুশিমত প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীদেরকে নিযুক্ত করতে পারবেন। মন্ত্রিগণ রাষ্ট্রপতির নিকট দায়ী থাকবেন। রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী বা মন্ত্রীদের পরামর্শ গ্রহণ করতে বাধ্য নন।

৩. উপ-রাষ্ট্রপতির পদ সৃষ্টি: এ সংশোধনী দ্বারা উপ-রাষ্ট্রপতি পদ সৃষ্টি হয়। চতুর্থ সংশোধনীতে বলা হয় যে, উপ-রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবেন এবং রাষ্ট্রপতি প্রয়োজনবোধে উপরাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করতে পারবেন।

৪. বিচার বিভাগের ক্ষমতা: চতুর্থ সংশোধনী দ্বারা বাংলাদেশের সকল বিচারপতির নিয়োগ এবং অসদাচরণ ও অসামর্থ্যের কারণে তাদেরকে অপসারণের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতিকে প্রদান করা হয়। এছাড়াও রাষ্ট্রপতিকে অধঃস্তন আদালতগুলোর বিচারক বা ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ এবং তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা বিধানের ক্ষমতাও অর্পণ করা হয়।

বাংলাদেশ সংবিধান (চতুর্থ সংশোধন) আইন, ১৯৭৫

৫. একদলীয় ব্যবস্থা : সংবিধানে সংযোজিত ৬ষ্ঠ-ক ভাগের ১১৭-ক অনুচ্ছেদে বলা হয় যে, রাষ্ট্রীয় মূলনীতিগুলোকে পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত করার জন্য রাষ্ট্রপতি প্রয়োজনবোধে একটিমাত্র 'জাতীয় দলের' বিধান করতে পারবেন। এরূপ একটিমাত্র দলের আদেশ জারির সাথে সাথে দেশের সকল রাজনৈতিক দল অবলুপ্ত হবে। এরপর রাষ্ট্রপতি 'জাতীয় দল' গঠন করবেন। জাতীয় দলের নামকরণ, সাংগঠনিক কাঠামো নির্ধারণ, সদস্যভুক্তি, শৃঙ্খলা, অর্থসংস্থান, দলের পদাধিকারী ব্যক্তিদের কর্তব্য ও দায়িত্বসংক্রান্ত সকল বিষয় রাষ্ট্রপতি আদেশবলে নির্ধারণ করবেন। এক্ষেত্রে তাঁর কর্তৃত্বই হবে চরম ও চূড়ান্ত।

৬. জাতীয় সংসদ সদস্যদের বাধ্যতামূলকভাবে জাতীয় দলের সদস্য পদ গ্রহণ: চতুর্থ সংশোধনীতে বলা হয় যে, জাতীয় দল গঠিত হবার পর রাষ্ট্রপতি প্রদত্ত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জাতীয় সংসদ সদস্যদেরকে জাতীয় দলের সদস্য হতে হবে। অন্যথায় তাঁদের সদস্যপদ বাতিল হয়ে যাবে এবং তারা ভবিষ্যতে রাষ্ট্রপতি বা জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হবার যোগ্য হবেন না।

৭. জাতীয় সংসদের মেয়াদ বৃদ্ধি: চতুর্থ সংশোধনী দ্বারা ১৯৭৩ সালে নির্বাচিত জাতীয় সংসদের মেয়াদকাল ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি হতে আরো ৫ বছর বাড়িয়ে দেওয়া হয়।

৮. জাতীয় সংসদ কর্তৃক আদালত বা ট্রাইব্যুনাল গঠন: মৌলিক অধিকার বলবৎ করার জন্য জাতীয় সংসদ কর্তৃক আদালত বা ট্রাইব্যুনাল গঠনের বিধান করা হয়। তবে সুপ্রিম কোর্টের বিভিন্ন ধরনের রীট আবেদন গ্রহণ করার ক্ষমতা আগের মতই বহাল থাকবে।

বাংলাদেশ সংবিধান (চতুর্থ সংশোধন) আইন, ১৯৭৫

৬. জাতীয় সংসদ সদস্যদের বাধ্যতামূলকভাবে জাতীয় দলের সদস্য পদ গ্রহণ: চতুর্থ সংশোধনীতে বলা হয় যে, জাতীয় দল গঠিত হবার পর রাষ্ট্রপতি প্রদত্ত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জাতীয় সংসদ সদস্যদেরকে জাতীয় দলের সদস্য হতে হবে। অন্যথায় তাঁদের সদস্যপদ বাতিল হয়ে যাবে এবং তারা ভবিষ্যতে রাষ্ট্রপতি বা জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হবার যোগ্য হবেন না।

৭. জাতীয় সংসদের মেয়াদ বৃদ্ধি: চতুর্থ সংশোধনী দ্বারা ১৯৭৩ সালে নির্বাচিত জাতীয় সংসদের মেয়াদকাল ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি হতে আরো ৫ বছর বাড়িয়ে দেওয়া হয়।

৮. জাতীয় সংসদ কর্তৃক আদালত বা ট্রাইব্যুনাল গঠন: মৌলিক অধিকার বলবৎ করার জন্য জাতীয় সংসদ কর্তৃক আদালত বা ট্রাইব্যুনাল গঠনের বিধান করা হয়। তবে সুপ্রিম কোর্টের বিভিন্ন ধরনের রীট আবেদন গ্রহণ করার ক্ষমতা আগের মতই বহাল থাকবে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – বাংলাদেশের সংবিধান

টপিক – ০৮ বাংলাদেশ সংবিধান (পঞ্চম সংশোধন) আইন, ১৯৭৯

টপিক ০৮: বাংলাদেশ সংবিধান (পঞ্চম সংশোধন) আইন, ১৯৭৯

This Topic is important for

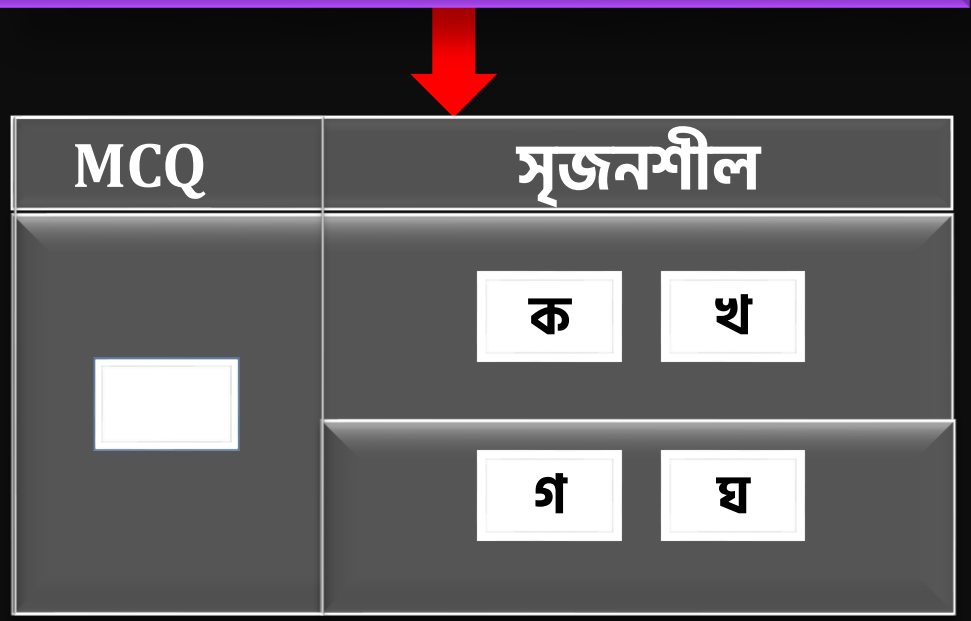

বাংলাদেশ সংবিধান (পঞ্চম সংশোধন) আইন, ১৯৭৯

পটভূমি: ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করার পর থেকে ১৯৭৯ সালের ৬ এপ্রিল পর্যন্ত বাংলাদেশে সামরিক আইন বলবৎ ছিল। এ সামরিক শাসনামলে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক পটপরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান বিভিন্ন সামরিক আইন, নির্দেশ, ঘোষণা, সামরিক আইন বিধি, অধ্যাদেশ এবং অন্যান্য আইন ও আদেশের মাধ্যমে সংবিধানে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ও সংশোধন সাধন করেন। জেনারেল জিয়াউর রহমানের সামরিক ফরমান-আদেশ-নির্দেশগুলোকে বৈধতা প্রদানের জন্য ১৯৭৯ সালের ৪ এপ্রিল তৎকালীন সংসদ নেতা ও প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান সংবিধান সংশোধনী বিল জাতীয় সংসদে উত্থাপন করেন। ১৯৭৯ সালের ৫ এপ্রিল জাতীয় সংসদ এ সংশোধনীসমূহ পাস করে এবং ৬ এপ্রিল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক তা অনুমোদিত হয়। ১৪ এটি বাংলাদেশ সংবিধানের "৫ম সংশোধনী" নামে খ্যাত।

বাংলাদেশ সংবিধান (পঞ্চম সংশোধন) আইন, ১৯৭৯

পঞ্চম সংশোধনীর বৈশিষ্ট্যসমূহ: বাংলাদেশ সংবিধানের ৫ম সংশোধনীর বৈশিষ্ট্যগুলো সংক্ষেপে নিম্নে আলোচনা করা হলো:

১. সংবিধানের প্রস্তাবনার পরিবর্তন:

ক. বাংলাদেশ সংবিধানের ৫ম সংশোধনীতে সংবিধানের প্রস্তাবনার শুরুতে "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম" অর্থাৎ "দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি"-এ কথাগুলো সংযোজন করা হয়।

খ. সংবিধানের প্রস্তাবনায় 'মুক্তি সংগ্রাম' শব্দগুচ্ছের পরিবর্তে "স্বাধীনতা যুদ্ধ" শব্দগুচ্ছ সন্নিবেশিত হয়।

২. রাষ্ট্রীয় মূলনীতির ক্ষেত্রে পরিবর্তন: ৫ম সংশোধনী দ্বারা রাষ্ট্রীয় মূলনীতির ক্ষেত্রে যেসব গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয় সেগুলো নিম্নরূপ:

ক. মূল সংবিধানে অন্যতম রাষ্ট্রীয় মূলনীতি ছিল "বাঙালি জাতীয়তাবাদ"। কিন্তু ৫ম সংশোধনীতে তা পরিবর্তন করে 'বাঙালি জাতীয়তাবাদকে' 'বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ' নামে আখ্যায়িত করা হয়।

খ. মূল সংবিধানে অন্যতম রাষ্ট্রীয় মূলনীতি ছিল "ধর্মনিরপেক্ষতা"। সংবিধানের ৫ম সংশোধনীতে 'ধর্মনিরপেক্ষতার' স্থলে 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর আস্থা ও বিশ্বাস' কথাগুলো সংযোজন করা হয়।

গ. সংবিধানের ৫ম সংশোধনীতে 'সমাজতন্ত্র' নামক অন্যতম রাষ্ট্রীয় মূলনীতিকে পরিবর্তন করে 'অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার'-এ অর্থে সমাজতন্ত্রকে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

বাংলাদেশ সংবিধান (পঞ্চম সংশোধন) আইন, ১৯৭৯

৩. ক্ষতিপূরণ প্রদান: সংবিধানের ৫ম সংশোধনীতে মৌলিক অধিকারের অধ্যায়ে ৪২ অনুচ্ছেদের ২য় ধারা সংশোধন করে সম্পত্তি দখল বা রাষ্ট্রায়ত্তকরণের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হয়।

৪. সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিল গঠন: ৫ম সংশোধনী দ্বারা সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং দুজন প্রবীণতম বিচারপতি নিয়ে "সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিল" নামে একটি পরিষদ গঠনের বিধান করা হয়। এ পরিষদ সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের জন্য আচরণ বিধি প্রণয়ন এবং তাদের সামর্থ্য ও আচরণ সম্পর্কে তদন্ত করে রিপোর্ট প্রদান করবেন। শুধুমাত্র এরূপ রিপোর্টের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি কোনো বিচারককে অপসারণ করতে পারবেন।

৫. রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও জাতীয় সংসদের সাথে সম্পর্ক: ৫ম সংশোধনীতে বলা হয় যে, রাষ্ট্রপতি এমন একজনকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করবেন যিনি অবশ্যই একজন সংসদ সদস্য এবং সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠের আস্থাভাজন হবেন। সংসদের বাইরে থেকে নিযুক্ত মন্ত্রীদের সংখ্যা মন্ত্রিপরিষদের এক-পঞ্চমাংশের বেশি হবে না। তবে মন্ত্রীদের ক্ষমতা ও কার্যকালের মেয়াদ সম্পর্কে পূর্বের মতোই বিধান করা হয় যে, মন্ত্রিগণ রাষ্ট্রপতির সন্তুষ্টি অনুযায়ী স্বীয়পদে বহাল থাকবেন।

বাংলাদেশ সংবিধান (পঞ্চম সংশোধন) আইন, ১৯৭৯

৬. জাতীয় সংসদের অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতা হ্রাস: ৫ম সংশোধনী দ্বারা জাতীয় সংসদের অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতা হ্রাস করা হয়। জাতীয় সংসদ যদি কোনো অর্থবছরের জন্য অর্থ মঞ্জুর করতে ব্যর্থ হন অথবা কোনো অর্থমঞ্জুরি দাবি প্রত্যাখ্যান কিংবা হ্রাস করেন তবে রাষ্ট্রপতি তা প্রদান করতে পারবেন। (৫ম সংশোধনীর পূর্ব পর্যন্ত সংসদের বিনা অনুমোদনে অর্থ ব্যয় করা যেত না।)

৭. জাতীয় সংসদের সংবিধান সংক্রান্ত ক্ষমতা হ্রাস: ৫ম সংশোধনীতে বিধান করা হয় যে, সংবিধানের প্রস্তাবনা, রাষ্ট্রীয় আদর্শ এবং সংবিধানের সংশোধন পদ্ধতি সম্পর্কিত কোনো সংশোধনী প্রস্তাব জাতীয় সংসদে গৃহীত হলে রাষ্ট্রপতি তা গণভোটে পেশ করবেন এবং কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে অনুমোদিত হলে তা কার্যকর হবে। (৫ম সংশোধনীর পূর্বে জাতীয় সংসদে অংশ ভোটে গৃহীত যে কোনো সংশোধনী 'আইনে' পরিণত হতো।)

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – বাংলাদেশের সংবিধান

টপিক – ০৯ বাংলাদেশ সংবিধান (ষষ্ঠ সংশোধন) আইন, ১৯৮১

টপিক ০৯: বাংলাদেশ সংবিধান (ষষ্ঠ সংশোধন) আইন, ১৯৮১

This Topic is important for

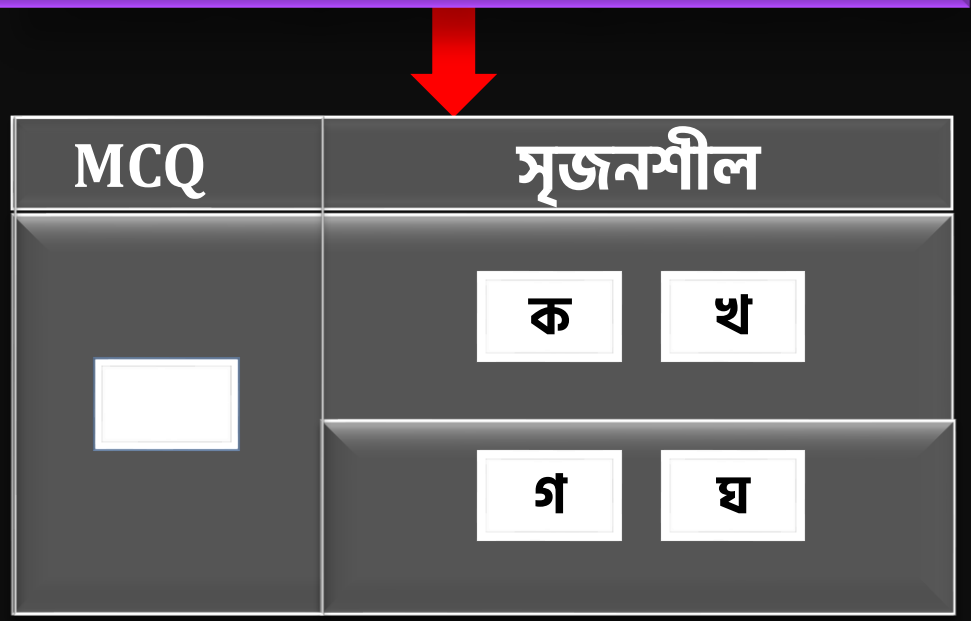

বাংলাদেশ সংবিধান (ষষ্ঠ সংশোধন) আইন, ১৯৮১

১৯৮১ সালের ৩০ মে মাসে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান চট্টগ্রাম সেনা বিদ্রোহে নিহত হলে সেদিনই উপরাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবদুস সাত্তার অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করে। ১৯৮১ সালের ১৫ নভেম্বর রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের দিন ধার্য করা হয়। বি. এন. পি বিচারপতি সাত্তারকে রাষ্ট্রপতি পদে তাদের প্রার্থীরূপে মনোনয়ন দান করতে সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু বিচারপতি সাত্তার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বৈধভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। কারণ তখন তিনি উপরাষ্ট্রপতি হিসেবে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের কর্মে 'লাভজনক পদে' আসীন ছিলেন। রাষ্ট্রপতি হিসেবে বিচারপতি সাত্তারের নির্বাচন-প্রার্থিতাকে সংবিধানসম্মত করার জন্য সংবিধান সংশোধন করার প্রয়োজন অনুভূত হয়। অর্থাৎ উক্ত সকল পদের সঙ্গে উপ-রাষ্ট্রপতির পদকেও নির্বাচনের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য লাভজনক পদ নয় বলে ঘোষণা করার আবশ্যকতা দেখা দেয়। ১৯৮১ সালের ১ জুলাই ষষ্ঠ সংশোধনী বিল জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হয়। আওয়ামী লীগ অধিবেশন বয়কট করে। বিলের পক্ষে ২৫২ ভোট পড়ে। বিপক্ষে কোনো ভোট পড়েনি।

বাংলাদেশ সংবিধানের 'ষষ্ঠ সংশোধনী বিল' ১৯৮১ সালের ১ জুলাই তৎকালীন সংসদ নেতা শাহ্ আজিজুর রহমান কর্তৃক জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হয় এবং ৮ জুলাই জাতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত হয়। রাষ্ট্রপতি ১০ জুলাই উক্ত বিল অনুমোদন করলে তা আইনে পরিণত হয়।

বাংলাদেশ সংবিধান (ষষ্ঠ সংশোধন) আইন, ১৯৮১

ষষ্ঠ সংশোধনীর ধারা বা বৈশিষ্ট্যসমূহ

১. সংবিধানের ৫১ (৪) উপধারা সংশোধন করে বলা হয় যে, "উপরাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতিরূপে নির্বাচিত হলে, তিনি যে তারিখে রাষ্ট্রপতি হিসেবে কার্যভার গ্রহণ করবেন সে তারিখেই তার উপরাষ্ট্রপতি পদ শূন্য হয়েছে বলে গণ্য হবে।"

২. সংবিধানের ৫১ (৫) উপধারা সংযোজন করে বলা হয় যে, "রাষ্ট্রপতি অথবা উপরাষ্ট্রপতি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হলে, তিনি রাষ্ট্রপতি অথবা উপরাষ্ট্রপতি পদে বহাল থাকা পর্যন্ত অনুরূপ সংসদ সদস্য থাকার যোগ্য হবেন না।"

৩. সংবিধানের ৫১ (৬) উপধারা সংযোজন করে বলা হয় যে, "কোনো সংসদ সদস্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত কিংবা উপরাষ্ট্রপতি নিযুক্ত হলে রাষ্ট্রপতি কিংবা উপরাষ্ট্রপতিরূপে তাঁর কার্যভার গ্রহণের দিন সংসদে তাঁর আসন শূন্য বলে গণ্য হবে।"

৪. সংবিধানের ৬৬নং অনুচ্ছেদের (২-ক) দফা পরিবর্তন করে বলা হয় যে, "(২-ক) এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে কোনো ব্যক্তি কেবল রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, উপপ্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী হবার কারণে প্রজাতন্ত্রের কর্মে কোনো লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত গণ্য হবেন না।"

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – বাংলাদেশের সংবিধান

টপিক – ১০ বাংলাদেশ সংবিধান (সপ্তম সংশোধন) আইন, ১৯৮৬

টপিক ১০: বাংলাদেশ সংবিধান (সপ্তম সংশোধন) আইন, ১৯৮৬

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

বাংলাদেশ সংবিধান (সপ্তম সংশোধন) আইন, ১৯৮৬

১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ থেকে ১৯৮৬ সালের ৯ নভেম্বর পর্যন্ত সামরিক শাসনামলের সকল ঘোষিত আদেশ, ফরমান এবং উক্ত ফরমান দ্বারা ঘোষিত সামরিক আইন, গৃহীত কার্যাবলি, নিয়োগ প্রভৃতি বৈধ করে নেওয়ার জন্য ১৯৮৬ সালের ১০ নভেম্বর তৃতীয় জাতীয় সংসদে তদানীন্তন আইনমন্ত্রী বিচারপতি এ. কে. এম. নুরুল ইসলাম 'সংবিধানের সংশোধনী বিল' উত্থাপন করেন। স্পিকার বিলটি 'হ্যাঁ' এবং 'না'-এর পক্ষ দ্বারা বিভক্তিকরণ ভোটে পেশ করেন। বিলটির 'হ্যাঁ'-এর পক্ষে ২২৩ জন সংসদ সদস্য ভোট প্রদান করেন (মুসলিম লীগের ৪ জন, জাসদের (রব) ৪ জন, জাসদের (সিরাজ) ৩ জন, বাকশালের ২ জন, স্বতন্ত্র ২ জন এবং জাতীয় পার্টির ২০৮ জন সংসদ সদস্য)। মূল বিরোধী দল আওয়ামী লীগসহ ৮ দলীয় ঐক্যজোটের প্রায় সব দলের সংসদ সদস্যগণই এ বিল সংসদে পেশকালে অধিবেশন বয়কট করেন। এরপর স্পিকার জাতীয় সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভোটে (২২৩-০) বিলটি গৃহীত হয়েছে বলে ঘোষণা প্রদান করেন। রাষ্ট্রপতির নিকট বিলটি প্রেরণ করা হলে তিনি ১১ নভেম্বর বিলটি অনুমোদন করেন এবং তা আইনে পরিণত হয়।১৬ এ আইনই সংবিধানের 'সপ্তম সংশোধনী আইন' নামে পরিচিত।

বাংলাদেশ সংবিধান (সপ্তম সংশোধন) আইন, ১৯৮৬

সংবিধানের সপ্তম সংশোধনী আইনের ধারা বা বৈশিষ্ট্যসমূহ: সংবিধানের '৭ম সংশোধনী আইনের' মূল ধারা বা বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ:

১. এ সংশোধনী আইন অনুযায়ী বিচারকদের চাকরিকালের বয়সসীমা ৬২ বছর থেকে বৃদ্ধি করে ৬৫ বছর করা হয়। সংশোধনীতে বলা হয় যে, "এ অনুচ্ছেদের (৯৬ নং অনুচ্ছেদ) অন্যান্য বিধানাবলি সাপেক্ষে কোনো বিচারক ৬৫ বছর বয়স পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত স্বীয়পদে বহাল থাকবেন।"

২. ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ থেকে ১৯৮৬ সালের ১০ নভেম্বর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সামরিক আইন প্রশাসকের সকল কার্যধারা ও কার্যক্রম অনুমোদন, সমর্থন ও বৈধ করা হয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – বাংলাদেশের সংবিধান

টপিক – ১১ বাংলাদেশ সংবিধান (অষ্টম সংশোধন) আইন, ১৯৮৮

টপিক ১১: বাংলাদেশ সংবিধান (অষ্টম সংশোধন) আইন, ১৯৮৮

This Topic is important for

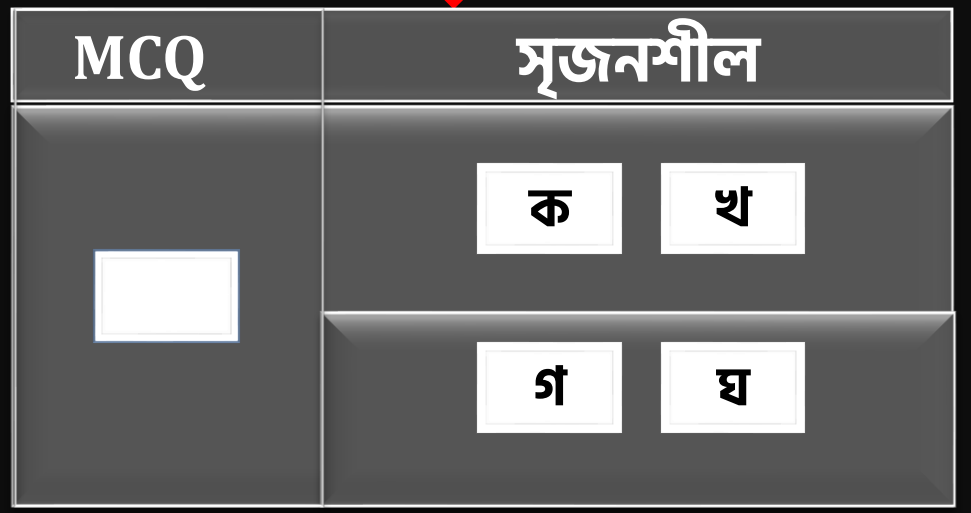

বাংলাদেশ সংবিধান (অষ্টম সংশোধন) আইন, ১৯৮৮

রাষ্ট্রপতি এইচ.এম. এরশাদের শাসনামলে তৎকালীন সংসদ নেতা ও প্রধানমন্ত্রী মওদুদ আহমদ ১৯৮৮ সালের ১১ মে চতুর্থ জাতীয় সংসদে সংবিধানের '৮ম সংশোধনী বিল' পেশ করেন। ৭ জুন বিলটি ২৫৪ ভোটে গৃহীত হয়। ৮ দল, ৭ দল, ৫ দল এবং জামায়াতে ইসলাম পূর্বেই সংসদ নির্বাচন বর্জন করায় তাঁরা সংসদের বাইরে এ বিলের সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠেন। ৯ জুন রাষ্ট্রপতি এ বিল অনুমোদন করলে তা আইনে পরিণত হয়।

বাংলাদেশ সংবিধান (অষ্টম সংশোধন) আইন, ১৯৮৮

অষ্টম সংশোধনী আইনের প্রধান প্রধান ধারা বা বৈশিষ্ট্য

১. অষ্টম সংশোধনীর ২(ক) ধারায় বলা হয় যে, 'প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্র ধর্ম হবে ইসলাম।' তবে অন্যান্য ধর্মাবলম্বিগণ শান্তি ও সম্প্রীতির সাথে নিজ নিজ ধর্ম পালন করতে পারবেন।

২. রংপুর, যশোর, বরিশাল, সিলেট, কুমিল্লা ও চট্টগ্রামে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনের স্থায়ী বেঞ্চ স্থাপনের বিধান করা হয়। (১৯৮৯ সালের ২ সেপ্টেম্বর সুপ্রিম কোর্টের এক রায়ে ঢাকার বাইরে প্রতিষ্ঠিত ৬টি স্থায়ী বেঞ্চ গঠনের বিধান সংবিধান বহির্ভূত বলে ঘোষণা করা হয়)

৩. রাষ্ট্রপতির পূর্ব অনুমতি ছাড়া কোনো নাগরিক কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের নিকট থেকে খেতাব, সম্মান, পুরস্কার বা ভূষণ গ্রহণ করতে পারবেন না বলে বিধান করা হয়।

৪. এ সংশোধন আইনে সংবিধানের ৩ ধারা পরিবর্তন করে বাংলা ভাষার ইংরেজি প্রতিশব্দ ঠিক করা হয় 'Bangla' (Bengali-র পরিবর্তে) এবং ৫ ধারা পরিবর্তন করে রাজধানী ঢাকার ইংরেজি নাম 'Dacca'-এর পরিবর্তে স্থির করা হয় 'Dhaka' ।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – বাংলাদেশের সংবিধান

টপিক – ১২ বাংলাদেশ সংবিধান (নবম সংশোধন) আইন, ১৯৮৯

টপিক ১২: বাংলাদেশ সংবিধান (নবম সংশোধন) আইন, ১৯৮৯

This Topic is important for

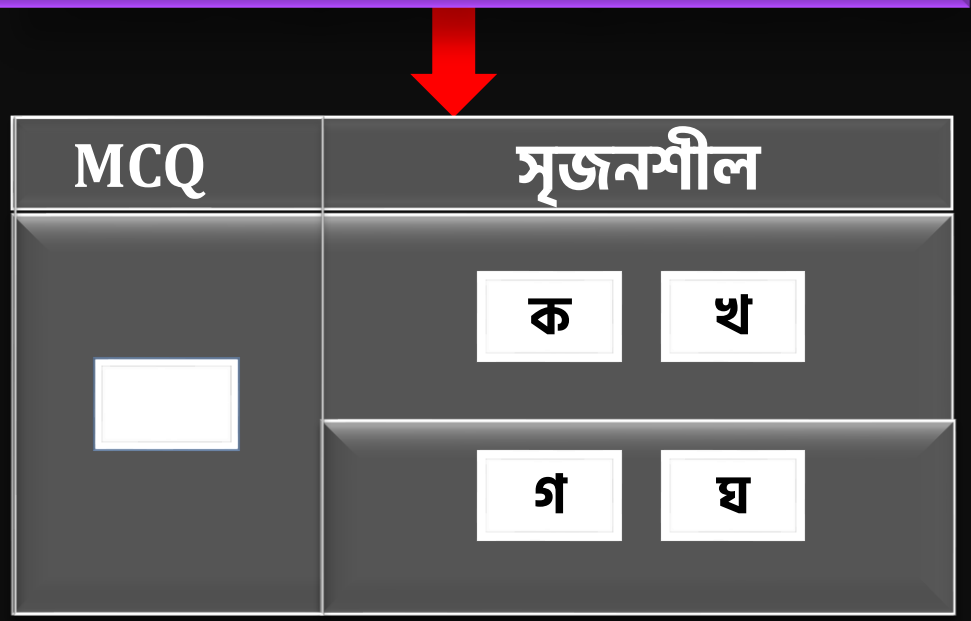

বাংলাদেশ সংবিধান (নবম সংশোধন) আইন, ১৯৮৯

১৯৮৯ সালের ৬ জুলাই বাংলাদেশের সংবিধানের নবম সংশোধনী বিল তৎকালীন আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ কর্তৃক চতুর্থ জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হয়। বিলটি জাতীয় সংসদ কর্তৃক ১০ জুলাই গৃহীত হবার পর ১১ জুলাই রাষ্ট্রপতি এ বিলে সম্মতি প্রদান করেন এবং এটি আইনে পরিণত হয়। এ বিল গ্রহণের পক্ষে ২৭২ ভোট এবং বিপক্ষে কোনো ভোট পড়েনি। নবম সংশোধনী অনুসারে সংবিধানের ৪৯, ৫০, ৫৩, ৫৪, ৭২, ১১৯, ১২২, ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১৪৮ ও ১৫২ অনুচ্ছেদ এবং সংবিধানের চতুর্থ তফসিল সংশোধন করা হয়।

নবম সংশোধনীর বৈশিষ্ট্য বা ধারা

১. প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট পদের মেয়াদ ৫ বছর করা হয়।

২. একাদিক্রমে দুই মেয়াদের অধিক সময়কাল কেউ রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন না। তবে সংবিধানের '৫৫ অনুচ্ছেদের' অধীনে প্রেসিডেন্টের কাজ করেছেন এমন কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে এ দফার কোনো কিছুই প্রযোজ্য হবে না।

৩. উপরাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্র দ্বারা রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করতে পারবেন।

৪. রাষ্ট্রপতি কিংবা উপরাষ্ট্রপতি পদে বহাল থাকা পর্যন্ত কেউ জাতীয় সংসদ সদস্য হবার যোগ্য হবেন না।

৫. রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি পদের জন্য নির্বাচন একই সাথে এবং একই সময়ে অনুষ্ঠিত হবে।

৬. নবম সংশোধনী প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে বিদ্যমান উপরাষ্ট্রপতি স্বীয় পদে বহাল থাকবেন।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – বাংলাদেশের সংবিধান

টপিক – ১৩ বাংলাদেশ সংবিধান (দশম সংশোধন) আইন, ১৯৯০

টপিক ১৩: বাংলাদেশ সংবিধান (দশম সংশোধন) আইন, ১৯৯০

This Topic is important for

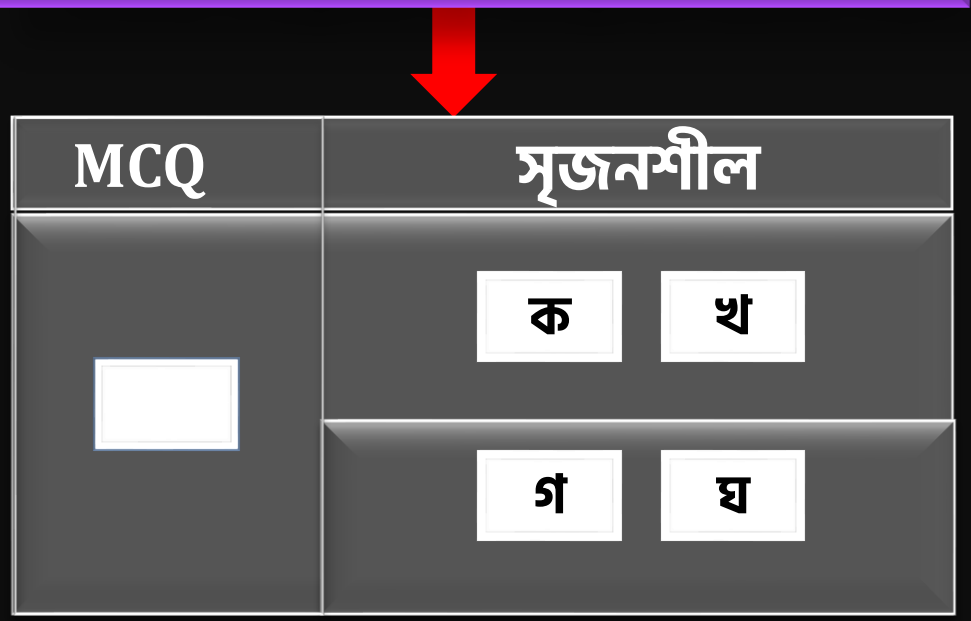

বাংলাদেশ সংবিধান (দশম সংশোধন) আইন, ১৯৯০

রাষ্ট্রপতি এইচ.এম. এরশাদের শাসনামলে ১৯৯০ সালের জাতীয় সংসদের গ্রীষ্মকালীন বাজেট অধিবেশনে ১০ জুন সংবিধান সংশোধন বিল সংসদে পেশ এবং ১২ জুন 'সংবিধানের দশম সংশোধনী বিল' পাস হয়। বিল পাসের সময় স্বতন্ত্র ও বিরোধী দলীয় সদস্যগণ ওয়াক আউট করেন। সংসদে এ বিলটি গৃহীত হয় ২২৬ ভোটে। ১৯৯০ সালের ২৩ জুন বিলটি রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভ করে আইনে পরিণত হয়।

দশম সংশোধনীর প্রধান প্রধান ধারা বা বৈশিষ্ট্যসমূহ

১. জাতীয় সংসদে ১০ বছরের জন্য ৩০টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। (১৯৭২ সালে প্রণীত বাংলাদেশ সংবিধানে ১০ বছরের জন্য ১৫টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ছিল।)

২. মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখের ৬ মাসের (১৮০ দিনের) মধ্যে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন সম্পন্ন হবে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – বাংলাদেশের সংবিধান

টপিক – ১৪ বাংলাদেশ সংবিধান (একাদশ সংশোধন) আইন, ১৯৯১

টপিক ১৪: বাংলাদেশ সংবিধান (একাদশ সংশোধন) আইন, ১৯৯১

This Topic is important for

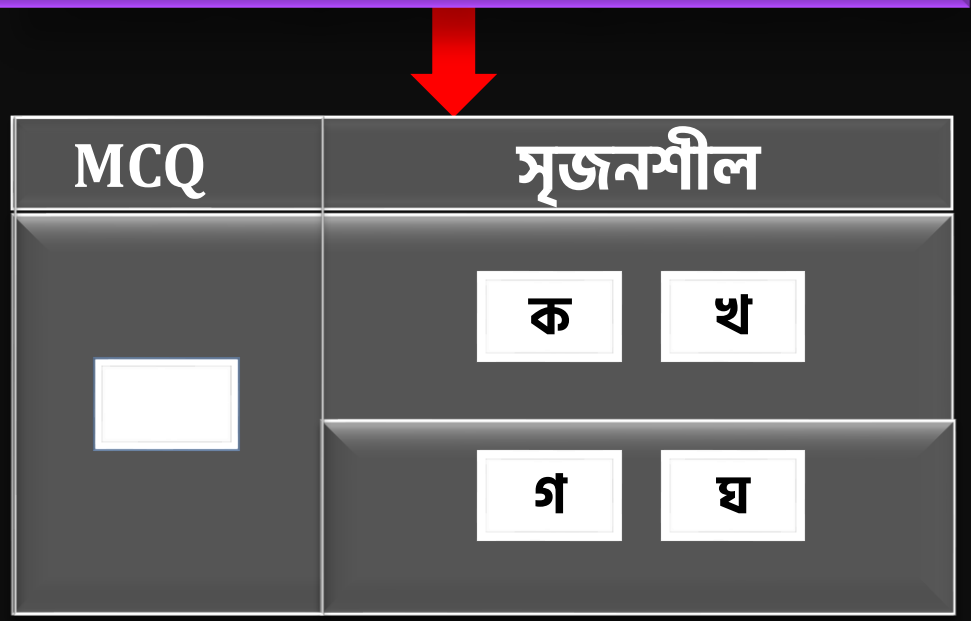

বাংলাদেশ সংবিধান (একাদশ সংশোধন) আইন, ১৯৯১

১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর থেকে ১৯৯১ সালের ৬ আগস্ট পর্যন্ত বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে নিয়োগ এবং উপরোক্ত সময়ে কৃত এবং গৃহীত কাজকর্ম অনুমোদনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এজন্যই তৎকালীন আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী মীর্জা গোলাম হাফিজ কর্তৃক জাতীয় সংসদে সংবিধান সংশোধন বিল উত্থাপিত হয়। ১৯৯১ সালের ৬ আগস্ট জাতীয় সংসদে বাংলাদেশ সংবিধানের 'একাদশ সংশোধনী বিল' পাস হয়। ২০ এ বিলের পক্ষে ২৭৮টি ভোট পড়ে। বিপক্ষে কোনো ভোট পড়েনি। জাতীয় পার্টি ও এন.ডি.পি. দলের সংসদ সদস্যগণ ভোটদানে বিরত থাকেন। এছাড়া উপস্থিত সকল সদস্যই অভূতপূর্ব সমঝোতা, আনন্দঘন ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে এ বিলের সাথে ঐকমত্য পোষণ করেন। ১৯৯১ সালের ১০ আগস্ট রাষ্ট্রপতি তা অনুমোদন করেন। এ আইন পাসের ফলে উপ-রাষ্ট্রপতি ও অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদের সকল কার্যকলাপ বৈধ বলে স্বীকৃত হয় এবং তার সপদে ফিরে যাবার পথ প্রশস্ত হয়।

বাংলাদেশ সংবিধান (একাদশ সংশোধন) আইন, ১৯৯১

একাদশ সংশোধনী আইনের বৈশিষ্ট্য বা ধারাসমূহ: বাংলাদেশ সংবিধানের একাদশ সংশোধনী আইনের ধারাসমূহ নিম্নরূপ :

১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২১ (১) অনুচ্ছেদে বলা হয় যে, ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর তারিখে তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক উপ-রাষ্ট্রপতি হিসেবে বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগ ও শপথ প্রদান এবং তার নিকট পদত্যাগ পত্র প্রদান বৈধ বলে গণ্য হবে। এছাড়া উক্ত তারিখ থেকে 'সংবিধানের একাদশ সংশোধনী আইন' প্রবর্তনের তারিখ পর্যন্ত উক্ত উপ-রাষ্ট্রপতি এবং অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে তাঁর প্রয়োগকৃত সকল ক্ষমতা, প্রণীত সকল আইন ও অধ্যাদেশ এবং প্রদত্ত, কৃত ও গৃহীত সকল আদেশ, সকল কাজকর্ম এবং গৃহীত সকল ব্যবস্থা অনুমোদিত ও সমর্থিত হয়।

২. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের একাদশ সংশোধনী আইন প্রবর্তনের পর এবং সংবিধান মোতাবেক নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়ে কার্যভার গ্রহণের পর উক্ত উপ-রাষ্ট্রপতি ও অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতির কার্যভার ও দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারবেন এবং উপ-রাষ্ট্রপতি ও অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালনের সময়কাল বিচারপতি হিসেবে তাঁর কর্মকাল হিসেবে গণ্য হবে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – বাংলাদেশের সংবিধান

টপিক – ১৫ বাংলাদেশ সংবিধান (দ্বাদশ সংশোধন) আইন, ১৯৯১

টপিক ১৫: বাংলাদেশ সংবিধান (দ্বাদশ সংশোধন) আইন, ১৯৯১

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

বাংলাদেশ সংবিধান (দ্বাদশ সংশোধন) আইন, ১৯৯১

পটভূমি: ৮, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোট, ছাত্র-জনতা, পেশাজীবী ও প্রগতিশীল সংস্কৃতি কর্মীদের দ্বারা সৃষ্ট গণ-আন্দোলনের চাপে ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর জেনারেল (অব.) এইচ. এম. এরশাদ রাষ্ট্রপতির পদ ত্যাগ করেন। আওয়ামী লীগ ১৯৯১ সালের ১৪ এপ্রিল তারিখে সংসদীয় সরকার প্রবর্তন ও অস্থায়ী রাষ্ট্রপতিকে পূর্বপদে ফিরে যাবার পথ সুগম করার জন্য সংবিধান সংশোধনী বিল জাতীয় সংসদে উত্থাপনের নোটিস প্রদান করেন। ১৯৯১ সালের ২ জুলাই তৎকালীন আইনমন্ত্রী মীর্জা গোলাম হাফিজ সংবিধান সংশোধন বিল জাতীয় সংসদে উত্থাপন করেন। ১৯৯১ সালের ৬ আগস্ট জাতীয় সংসদে এক হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে সংবিধানের 'দ্বাদশ সংশোধনী বিল' গৃহীত হয়। ২১ এ বিলের পক্ষে ৩০৭টি ভোট পড়ে। বিপক্ষে কোনো ভোট পড়েনি। তারপর রাষ্ট্রপতি এ বিলের ওপর গণভোট আয়োজন করেন। এভাবে ১০ আগস্ট তা আইনে পরিণত হয়।

বাংলাদেশ সংবিধান (দ্বাদশ সংশোধন) আইন, ১৯৯১

দ্বাদশ সংশোধন আইনের বৈশিষ্ট্য বা ধারাসমূহ: বাংলাদেশ সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী আইনের ধারাসমূহ নিম্নরূপ:

১. জনপ্রতিনিধিদের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ: বাংলাদেশ সংবিধানের ১১ অনুচ্ছেদে বলা হয় যে, "প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে"।

২. রাষ্ট্রপতি সম্পর্কিত বিধান: সংবিধানের 'চতুর্থ ভাগের ১ম ও ২য় পরিচ্ছেদ' সংশোধন করে বলা হয় যে,

(ক) বাংলাদেশের একজন রাষ্ট্রপতি থাকবেন এবং তিনি জাতীয় সংসদ সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হবেন।

(খ) রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের অন্য সকল ব্যক্তির ঊর্ধ্বে স্থান লাভ করবেন। কেবলমাত্র প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্র ব্যতীত তার সকল দায়িত্ব পালনে তিনি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করবেন।

(গ) সংবিধানের ৫০ অনুচ্ছেদে বলা হয় যে, রাষ্ট্রপতি কার্যভার গ্রহণের তারিখ থেকে পাঁচ বছর মেয়াদে তার পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন এবং রাষ্ট্রপতির পদের মেয়াদ শেষ হওয়া সত্ত্বেও তার উত্তরাধিকারী কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত তিনি স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। একাদিক্রমে হোক বা না হোক দুই মেয়াদের অধিক রাষ্ট্রপতির পদে কোনো ব্যক্তি অধিষ্ঠিত থাকবেন না।

(ঘ) স্পিকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে রাষ্ট্রপতি স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন। কোনো সংসদ সদস্য রাষ্ট্রপতিরূপে তার কার্যভার গ্রহণের দিনে সংসদে তাঁর আসন শূন্য হবে।

(ঙ) সংবিধান লঙ্ঘন বা গুরুতর অসদাচরণের অভিযোগে রাষ্ট্রপতিকে জাতীয় সংসদ সদস্যদের অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে অভিশংসিত করে অপসারণ করা যাবে।

বাংলাদেশ সংবিধান (দ্বাদশ সংশোধন) আইন, ১৯৯১

৩. উপ-রাষ্ট্রপতি পদ বিলোপ: সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী আইন দ্বারা উপরাষ্ট্রপতির পদ বিলুপ্ত হয়। এ আইনে বিধান করা হয় যে, রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হলে বা কোনো কারণে রাষ্ট্রপতি তার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হলে জাতীয় সংসদের স্পিকার অস্থায়ীভাবে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করবেন।

৪. প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা সম্পর্কিত বিধান: (ক) যে সংসদ সদস্য সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের আস্থাভাজন হবেন রাষ্ট্রপতি তাঁকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করবেন। তবে সংসদীয় রীতি অনুযায়ী জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকেই রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করবেন।

(খ) প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের একটি মন্ত্রিসভা থাকবে। প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিসভার সদস্যগণকে বাছাই করবেন। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীদেরকে নিয়োগদান করবেন।

(গ) মন্ত্রিসভা যৌথভাবে জাতীয় সংসদের নিকট দায়ী থাকবে।

(ঘ) মন্ত্রিসভার মোট সদস্যের অন্যূন নয়-দশমাংশ জাতীয় সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে নিযুক্ত হবেন এবং অনধিক এক-দশমাংশ সংসদ সদস্য হবার যোগ্য ব্যক্তিদের মধ্য থেকে নিয়োগ করা যাবে।

(ঙ) জাতীয় সংসদ সদস্য নন এমন মন্ত্রিগণ সংসদের কার্যাবলিতে অংশগ্রহণ করতে পারলেও সংসদে ভোটদান করতে এবং তাঁর মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত বিষয় ব্যতীত অন্য বিষয়ে বক্তব্য রাখতে পারবেন না।

(চ) প্রধানমন্ত্রীর পদ শূন্য হবে যদি তিনি কোনো সময় রাষ্ট্রপতির নিকট পদত্যাগ পত্র প্রদান করেন অথবা তিনি সংসদ সদস্য না থাকেন। জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন হারালে প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করবেন কিংবা সংসদ ভেঙে দেওয়ার জন্য লিখিতভাবে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দান করবেন। প্রধানমন্ত্রী এরূপ পরামর্শ প্রদান করলে এবং রাষ্ট্রপতি যদি এ মর্মে উপলব্ধি করেন বা সন্তুষ্ট হন যে অন্য কোনো সংসদ সদস্য জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন নন, তাহলে সংসদ ভেঙে দিবেন। এক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর উত্তরাধিকারী কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত তিনি উক্ত দায়িত্ব পালন করবেন।

(ছ) প্রধানমন্ত্রী ব্যতীত অন্য কোনো মন্ত্রীর পদ শূন্য হবে যদি (১) তিনি রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে নিজের পদত্যাগপত্র পেশ করেন, (২) যদি তিনি সংসদ সদস্য না থাকেন (৫৬ অনুচ্ছেদের ২ দফার শর্তাধীন মনোনীত মন্ত্রী ব্যতীত), (৩) যদি প্রধানমন্ত্রী যে-কোনো সময় যে কোনো মন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে অনুরোধ করেন এবং উক্ত মন্ত্রী উক্ত অনুরোধ পালনে অসমর্থ হন, তাহলে প্রধানমন্ত্রী উক্ত মন্ত্রীর নিয়োগের অবসান ঘটানোর জন্য রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দান করতে পারবেন। (৪) যদি প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করেন বা স্বীয়পদে বহাল না থাকেন তাহলে মন্ত্রিগণ প্রত্যেকে পদত্যাগ করেছেন বলে গণ্য হবে। তবে তাদের উত্তরাধিকারিগণ কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত তাঁরা স্ব-স্ব পদে বহাল থাকবেন।

৫. উপ-প্রধানমন্ত্রী পদ বিলোপ: দ্বাদশ সংশোধনী আইন দ্বারা উপ-প্রধানমন্ত্রী পদ বিলোপ ঘোষণা করা হয়।

৬. জাতীয় সংসদ সম্পর্কিত বিধান: (ক) সংবিধানের '৭২ অনুচ্ছেদের' সংশোধন করে বলা হয় যে, জাতীয় সংসদের অধিবেশনের সমাপ্তি ও পরবর্তী অধিবেশনের প্রথম বৈঠকের মধ্যে ষাট দিনের অতিরিক্ত বিরতি থাকবে না। (খ) বিদেশের সাথে সম্পাদিত চুক্তি জাতীয় সংসদে পেশ করতে হবে, 'তবে শর্ত থাকে যে, জাতীয় নিরাপত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট অনুরূপ কোনো চুক্তি কেবল সংসদের গোপন বৈঠকে পেশ করা হবে।'

(গ) সংবিধানের '৭০ অনুচ্ছেদ' সংশোধন ও প্রতিস্থাপন করে বলা হয় যে, কোনো নির্বাচনে কোনো রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরূপে মনোনীত হয়ে কোনো ব্যক্তি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হলে তিনি যদি উক্ত দল থেকে পদত্যাগ করেন অথবা সংসদে উক্ত দলের বিপক্ষে ভোটদান করেন, তাহলে সংসদে তাঁর আসন শূন্য হবে। সংসদে উপস্থিত থেকে ভোটদানে বিরত থাকা এবং সংসদের কোনো বৈঠকে অনুপস্থিত থাকা নিজ দলের বিপক্ষে ভোটদান বলে গণ্য হবে।

(ঘ) কোনো রাজনৈতিক দলের সংসদীয় নেতৃত্ব সম্পর্কে যদি কোনো প্রশ্ন ওঠে তাহলে সংসদে সেই দলের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের নেতৃত্বে দাবিদার কোনো সদস্য কর্তৃক লিখিতভাবে অবহিত হবার সাতদিনের মধ্যে স্পিকার উক্ত দলের সকল সংসদ সদস্যের সভা আহ্বান করে বিভক্ত ভোটের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের দ্বারা উক্ত দলের সংসদীয় নেতৃত্ব নির্ধারণ করবেন। কোনো সংসদ সদস্য নির্ধারিত সংসদীয় নেতৃত্বের নির্দেশ অমান্য করলে ধরে নিতে হবে যে, তিনি তাঁর দলের বিপক্ষে ভোটদান করেছেন এবং সংসদে তাঁর আসন শূন্য হবে।

(ঙ) যদি কোনো ব্যক্তি নির্দলীয় প্রার্থীরূপে জাতীয় সংসদে নির্বাচিত হয়ে কোনো রাজনৈতিক দলে যোগদান করেন তাহলে তিনি উক্ত দলের মনোনীত প্রার্থীরূপে সংসদ সদ্য নির্বাচিত হয়েছেন বলে গণ্য হবে এবং তাঁকে উক্ত দলের সংসদীয় নেতার নির্দেশ মেনে চলতে হবে।

৭. গণভোট সম্পর্কিত: সংবিধানের ৮, ৪৮, ৫৬ ও ১৪২ অনুচ্ছেদ সম্পর্কিত কোনো সংশোধনী বিল জাতীয় সংসদে দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত হলে রাষ্ট্রপতি তা 'গণভোটে' পেশ করবেন।

৮. স্থানীয় শাসন সম্পর্কিত: আইনানুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হবে। জাতীয় সংসদ স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থানীয় প্রয়োজনে কর আরোপ করার ক্ষমতাসহ বাজেট প্রস্তুতকরণ ও নিজস্ব তহবিল রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা প্রদান করবেন।"

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – বাংলাদেশের সংবিধান

টপিক – ১৬ বাংলাদেশ সংবিধান (ত্রয়োদশ সংশোধন) আইন, ১৯৯৬

টপিক ১৬: বাংলাদেশ সংবিধান (ত্রয়োদশ সংশোধন) আইন, ১৯৯৬

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

বাংলাদেশ সংবিধান (ত্রয়োদশ সংশোধন) আইন, ১৯৯৬

পটভূমি: বেগম খালেদা জিয়ার শাসনামলে মাগুরা ও মিরপুর উপ-নির্বাচন দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনকে উত্তপ্ত ও অশান্ত করে তোলে। আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি, জামায়াতে ইসলাম, ওয়ার্কার্স পার্টি, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলসহ প্রায় সবকটি বিরোধী দল থেকে অভিযোগ উত্থাপিত হয় যে, এসব নির্বাচনে ব্যাপক ভোট কারচুরি হয়েছে। বিরোধী দলগুলো 'নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার'-এর অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সংবিধান সংশোধনের দাবি জানায়। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে বিরোধী দলগুলো আন্দোলনও গড়ে তোলে। এ আন্দোলনের মাঝেই বি.এন.পি. সরকার ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদের নির্বাচন সম্পন্ন করে। বেগম খালেদা জিয়ার শাসনামলে ষষ্ঠ জাতীয় সংসদে ১৯৯৬ সালের ২১ মার্চ তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকার কর্তৃক সংবিধান সংশোধন বিল জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হয়। ২৭ মার্চ বিলটি জাতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত হয়। ২৮ মার্চ তা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদিত হয়ে আইনে পরিণত হয়। ২২ ত্রয়োদশ সংশোধনী আইনের ধারাগুলো নিম্নরূপ:

বাংলাদেশ সংবিধান (ত্রয়োদশ সংশোধন) আইন, ১৯৯৬

ত্রয়োদশ সংশোধনী আইনের বৈশিষ্ট্য

নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার: সংবিধানের ৫৮-খ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, (১) সংসদ ভেঙ্গে দেওয়ার পর বা মেয়াদ অবসানের কারণে ভেঙ্গে যাবার পর যে তারিখে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা কার্যভার গ্রহণ করেন সে তারিখ হতে সংসদ গঠিত হবার পর নতুন প্রধানমন্ত্রী তার পদের কার্যভার গ্রহণ করার তারিখ পর্যন্ত মেয়াদে একটি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার থাকবে।

(২) নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার যৌথভাবে রাষ্ট্রপতির নিকট দায়ী থাকবেন।

(৩) প্রধান উপদেষ্টা কর্তৃক বা তার কর্তৃত্বে এ সংবিধান অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রযুক্ত হবে এবং নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পরামর্শ অনুযায়ী তৎকর্তৃক তা প্রযুক্ত হবে।

(৪) তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সকল নির্বাহী কাজ রাষ্ট্রপতির নামে গৃহীত হয়েছে বলে বিবেচিত হবে। সকল আদেশ ও চুক্তিপত্র রাষ্ট্রপতি বিধিসমূহ দ্বারা নির্ধারণ করবেন এবং ওসব ক্ষেত্রে আদালতে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না। রাষ্ট্রপতি সরকারি কার্যাবলি বণ্টন ও পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন করবেন।

বাংলাদেশ সংবিধান (ত্রয়োদশ সংশোধন) আইন, ১৯৯৬

নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের গঠন ও উপদেষ্টাগণের নিয়োগ: (১) প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বে প্রধান উপদেষ্টা এবং অপর অনধিক দশজন উপদেষ্টার সমন্বয়ে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হবে। রাষ্ট্রপতির দ্বারা তারা নিযুক্ত হবেন।

(২) সংসদ ভেঙ্গে দেওয়ার বা ভঙ্গ হওয়ার পরবর্তী পনের দিনের মধ্যে প্রধান উপদেষ্টা ও অন্যান্য উপদেষ্টাগণ নিযুক্ত হবেন এবং নিযুক্ত হওয়ার তারিখ পর্যন্ত অব্যবহিত পূর্বে দায়িত্ব পালনরত প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা তাঁদের দায়িত্ব পালন করবেন।

(৩) সুপ্রিম কোর্টের সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত এবং উপদেষ্টা হওয়ার যোগ্য প্রধান বিচারপতিকে রাষ্ট্রপতি প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করবেন। তবে তিনি রাজি না হলে বা পাওয়া না গেলে তাঁর অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত এবং উপদেষ্টা হওয়ার যোগ্য প্রধান বিচারপতিকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করবেন।

(৪) তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোনো প্রধান বিচারপতি রাজি না হন বা পাওয়া না যায় তবে আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত এবং উপদেষ্টা হওয়ার যোগ্য সর্বশেষ বিচারককে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করবেন। যদি তিনি রাজি না হন তা হলে তাঁর অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত উপদেষ্টা হওয়ার যোগ্য বিচারককে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করবেন।

(৫) যদি আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত কোনো বিচারককে পাওয়া না যায় তবে রাষ্ট্রপতি দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহের সাথে আলোচনাক্রমে উপদেষ্টা হওয়ার যোগ্য এরূপ বাংলাদেশি কোনো নাগরিককে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করবেন।

(৬) যদি ৩, ৪ ও ৫ দফায় বর্ণিত বিধান কার্যকরী করা না হয় তবে রাষ্ট্রপতি নিজেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।

(৭) উপদেষ্টা হওয়ার যোগ্যতা: উপদেষ্টা হতে হলে কোনো ব্যক্তিকে-

(ক) সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য হতে হবে।
(খ) কোনো রাজনৈতিক দল বা রাজনৈতিক দলের সঙ্গে অঙ্গীভূত কোনো সংগঠনের সদস্য হওয়া চলবে না।
(গ) সংসদের আসন্ন নির্বাচনে প্রার্থী নন বা হবেন না, এ মর্মে লিখিত অঙ্গীকার দিতে হবে এবং
(ঘ) বাহাত্তর বছরের অধিক বয়স্ক হওয়া চলবে না।
(৮) রাষ্ট্রপতি প্রধান উপদেষ্টার পরামর্শ অনুযায়ী উপদেষ্টাগণকে নিয়োগ করবেন।
(৯) রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে লিখিত ও স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে প্রধান উপদেষ্টা বা কোনো উপদেষ্টা স্বীয় পদত্যাগ করতে পারবেন।
(১০) প্রধান উপদেষ্টা প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদা ও পারিশ্রমিক এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা লাভ করবেন। উপদেষ্টাগণ মন্ত্রীর পদমর্যাদা, পারিশ্রমিক ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা লাভ করবেন।
(১১) নতুন সংসদ গঠিত হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী যে তারিখে কার্যভার গ্রহণ করবেন সে তারিখে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিলুপ্ত হবে।

বাংলাদেশ সংবিধান (ত্রয়োদশ সংশোধন) আইন, ১৯৯৬

নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কার্যাবলি:

(১) নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার হিসেবে
দায়িত্ব পালন করবেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের সাহায্যে দৈনন্দিন কার্যাদি সম্পাদন করবেন এবং প্রয়োজন ব্যতীত নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন না।

(২) নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার শান্তিপূর্ণ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদ সদস্য নির্বাচনের জন্য
নির্বাচন কমিশনকে সর্বোতভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করবেন।

প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা: রাষ্ট্রপতি সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান থাকবেন এবং আইনানুযায়ী দায়িত্ব পালন করবেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদকালে অনুরূপ ক্ষমতা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রযুক্ত হবে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – বাংলাদেশের সংবিধান

টপিক – ১৭ বাংলাদেশ সংবিধান (চতুর্দশ সংশোধন) আইন, ২০০৪

টপিক ১৭: বাংলাদেশ সংবিধান (চতুর্দশ সংশোধন) আইন, ২০০৪

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

বাংলাদেশ সংবিধান (চতুর্দশ সংশোধন) আইন, ২০০৪

বাংলাদেশ সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনী জাতীয় সংসদে গৃহীত হয় ২০০৪ সালের ১৬ মে এবং ১৭ মে তা রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভ করে। এ সংশোধন দ্বারা বাংলাদেশ সংবিধানের নিম্নলিখিত সংশোধন ও সংযোজন করা হয়:

১. সংরক্ষিত নারী আসন: জাতীয় সংসদে মহিলা আসন সংরক্ষণের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় সংবিধানের ৬৫নং অনুচ্ছেদ মোতাবেক জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য ১০ বছরের জন্য ৪৫টি আসন সংরক্ষিত রাখার বিধান করা হয়।

২. প্রতিকৃতি সংরক্ষণ: বাংলাদেশ সংবিধানের ৪(ক) নতুন অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর প্রতিকৃতি সংরক্ষণ সম্পর্কে বিধান করা হয়।

ক. রাষ্ট্রপতির প্রতিকৃতি: বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও স্পিকারের কার্যালয় এবং বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাস ও মিশনসমূহে রাষ্ট্রপতির প্রতিকৃতি প্রদর্শন করতে হবে।

খ. প্রধানমন্ত্রীর প্রতিকৃতি: বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও স্পিকারের কার্যালয়, সকল সরকারি ও আধা-সরকারি অফিস, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, সংবিধিবদ্ধ সরকারি অফিসসমূহ, সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাস ও মিশনসমূহে সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করতে হবে।

৩. অর্থ বিল: সংবিধানের ৮২নং অনুচ্ছেদ সংশোধন করে 'সরকারি অর্থ ব্যয়ের সাথে জড়িত রয়েছে এমন কোনো অর্থ বিল বা বিল' শব্দগুলো ও কমার পরিবর্তে 'কোনো অর্থ বিল অথবা সরকারি অর্থ ব্যয়ের প্রশ্ন জড়িত রয়েছে এমন কোনো বিল' শব্দগুলো ও কমা প্রতিস্থাপন করা হয়।

বাংলাদেশ সংবিধান (চতুর্দশ সংশোধন) আইন, ২০০৪

৫. বিচারপতির বয়সসীমা: সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের অবসর গ্রহণের বয়সসীমা ৬৫ বছর থেকে বাড়িয়ে ৬৭ বছর করা হয়।

৬. পি.এস.সি. চেয়ারম্যান ও সদস্যদের বয়সসীমা: পি.এস.সি.-এর চেয়ারম্যান ও সদস্যদের অবসর গ্রহণের বয়সসীমা ৬২ বছর থেকে বাড়িয়ে ৬৫ বছর করা হয়।

৭. সি.এ.জি-এর বয়সসীমা: মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (সি.এ.জি)-এর দায়িত্ব গ্রহণের তারিখ হতে পাঁচ বছর বা তাঁর বয়স ৬৫ বছর পূর্ণ হওয়া-এর মধ্যে যা আগে ঘটবে সেই সময় পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকবেন।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – বাংলাদেশের সংবিধান

টপিক – ১৮ বাংলাদেশ সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১

টপিক ১৮: বাংলাদেশ সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

বাংলাদেশ সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১

পটভূমি: ২০০৫ সালের ২৯ আগস্ট সংবিধানের ৫ম সংশোধনীকে হাইকোর্ট অবৈধ ও বাতিল ঘোষণা করে। ২০১১ সালের ১০ মে সুপ্রিম কোর্টের সাত বিচারপতির সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীকেও সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক বলে বাতিল ঘোষণা করে। এ রায়ে বলা হয় যে, "১৯৯৬ সালে আনা সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ায় এখন থেকে এটি বাতিল করা হলো।" তবে বিচার বিভাগ তাঁদের পর্যবেক্ষণে বলেন যে, দশম ও একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন বিদ্যমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাঠামোতে অনুষ্ঠিত হতে পারে, যদিও এটা আইনের চোখে বেআইনি। ২৪ আদালতের এ রায়ের ফলে সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ২০১০ সালের ২১ জুলাই প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতা শেখ হাসিনার প্রস্তাবে সংবিধান সংশোধনের জন্য জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালি বিধির ২৬৬ বিধি মোতাবেক ১৫ সদস্যবিশিষ্ট 'বিশেষ কমিটি' গঠন করা হয়। এ কমিটির চেয়ারম্যান করা হয় জাতীয় সংসদ উপনেতা সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী এবং কো-চেয়ারম্যান করা হয় সুরঞ্জিত সেনগুপ্তকে। এ কমিটি ২৭টি বৈঠক করে ৫১ দফা সুপারিশ সংবলিত

বাংলাদেশ সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১

সংবিধান সংশোধন প্রতিবেদন চূড়ান্ত করে ৫ জুন ২০১১। এরপর কমিটির ১৫ সদস্যের স্বাক্ষরসহ ৪০ পৃষ্ঠার প্রতিবেদন সংসদে উপস্থাপন করা হয় ৮ জুন ২০১১। ২৫ জুন ২০১১ সংসদে 'বিল' আকারে উত্থাপিত হয় সংবিধান সংশোধন কমিটির সুপারিশ। বিলটির নামকরণ করা হয় 'সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) বিল ২০১১'। স্পিকার বিলটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক সংসদীয় কমিটিতে প্রেরণ করেন। সংসদীয় কমিটি ২৯ জুন ২০১১ চার দফা সংশোধনীসহ মোট ৫৫ দফা সংবলিত বিলটির প্রতিবেদন প্রদান করে। এরপর ৩০ জুন ২০১১ জাতীয় সংসদে প্রথম কণ্ঠভোটে এবং পরে দু'দফা বিভক্তি ভোটে পাস হয় 'সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন ২০১১।' বাংলাদেশের ২৩ বছরের সংসদীয় রাজনীতির ইতিহাসে প্রথম টেকনোক্র্যাট মন্ত্রী হিসেবে সংবিধান সংশোধনীর প্রস্তাব সংসদে উত্থাপন করেন ব্যারিস্টার শফিক আহমদ।

বাংলাদেশ সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১

সংশোধনী প্রস্তাব বাতিলের বিভক্তি ভোটের সময় সংবিধানে 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, বিসমিল্লাহ ও ধর্মভিত্তিক রাজনীতি' রাখার ব্যাপারে 'নোট অব ডিসেন্ট' দিয়ে স্বাক্ষর করেন মহাজোটের তিন শরিক ওয়ার্কার্স পার্টি, জাসদ ও ন্যাপের ৬ জন সংসদ সদস্য। মোট ৩৪৫ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে ভোটাভুটিতে অংশ নেন ২৯২ জন। মহিলাসহ বিএনপি'র ৩৬, জামায়াতের ২, বিজেপির ১ ও এলডিপি'র ১ জনসহ ৫২ জন সদস্য অনুপস্থিত ছিলেন। সংশোধনীতে দু'দফা বিভক্তি ভোটে একমাত্র বিপক্ষে ভোট দেন স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য ফজলুল আজিম। ৩ জুলাই ২০১১ মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ জিল্লুর রহমান সম্মতি দান করলে এ বিলটি আইনে পরিণত হয় এবং এর নাম হয় 'সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন ২০১১'।

বাংলাদেশ সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১

সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর বৈশিষ্ট্য

১. সংবিধানের প্রারম্ভে প্রস্তাবনার উপরে সংশোধন: সংবিধানের প্রারম্ভে, প্রস্তাবনার উপরে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম' (দয়াময়, পরম দয়ালু, আল্লাহ্র নামে)/ 'পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তার নামে' সংযোজন করা হয়।

২. সংবিধানের প্রস্তাবনার সংশোধন: সংবিধানের প্রস্তাবনা সংশোধন করে বলা হয় যে, "সংবিধানের প্রস্তাবনার-

(ক) 'জাতীয় স্বাধীনতার জন্য ঐতিহাসিক যুদ্ধের' শব্দগুলোর পরিবর্তে 'জাতীয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রামের' শব্দগুলো প্রতিস্থাপিত হবে; এবং

(খ) নিম্নরূপ দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ প্রতিস্থাপিত হবে, যথা:

"আমরা অঙ্গিকার করছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সে সকল আদর্শ এ সংবিধানের মূলনীতি হবে"।

৩. প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম: রাষ্ট্রধর্ম সম্পর্কে বলা হয় যে, 'প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানসহ অন্যান্য ধর্ম পালনে রাষ্ট্র সমমর্যাদা ও সমঅধিকার নিশ্চিত করবেন'।

৪. জাতির পিতার প্রতিকৃতি: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পিকার ও প্রধান বিচারপতি কার্যালয় এবং সকল সরকারি ও আধা-সরকারি অফিস, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের প্রধান ও শাখা কার্যালয়, সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাস ও মিশনসমূহে সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করতে হবে।

বাংলাদেশ সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১

৬. সংবিধান বাতিল, স্থগিতকরণ ইত্যাদি অপরাধ: (১) কোনো ব্যক্তি শক্তি প্রদর্শন বা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বা অন্য কোনো অসাংবিধানিক পন্থায়-

(ক) এ সংবিধান বা এর কোনো অনুচ্ছেদ রদ, রহিত, বাতিল বা স্থগিত করলে কিংবা তা করবার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ বা ষড়যন্ত্র করলে, কিংবা

(খ) এ সংবিধান বা এর কোনো বিধানের প্রতি নাগরিকের আস্থা, বিশ্বাস বা প্রত্যয় পরাহত করলে কিংবা তা করবার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ বা ষড়যন্ত্র করলে- তার এই কাজ রাষ্ট্রদ্রোহিতা হবে এবং ঐ ব্যক্তি রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে দোষী হবে।

(২) কোনো ব্যক্তি

(১) দফায় বর্ণিত-

(ক) কোনো কাজ করতে সহযোগিতা বা উস্কানি প্রদান করলে, কিংবা

(খ) কাজ অনুমোদন, মার্জনা, সমর্থন বা অনুসমর্থন করলে- তার এরূপ কাজও একই অপরাধ হবে।

(৩) এ অনুচ্ছেদে বর্ণিত অপরাধে দোষী ব্যক্তি প্রচলিত আইনে অন্যান্য অপরাধের জন্য নির্ধারিত দণ্ডের মধ্যে সর্বোচ্চ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

বাংলাদেশ সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১

৭. সংবিধানের মৌলিক বিধানাবলি সংশোধন অযোগ্য: সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদে যা কিছুই থাকুকনা কেন, সংবিধানের প্রস্তাবনা, সংবিধানের অন্যান্য মৌলিক কাঠামো সংক্রান্ত অনুচ্ছেদসমূহের বিধানাবলি সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন, রহিতকরণ কিংবা অন্য কোনো পন্থায় সংশোধনের অযোগ্য হবে।

৮. রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি সংশোধন: (১) জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা এ নীতিসমূহ এবং তৎসহ এ নীতিসমূহ হতে উদ্ভূত এ ভাগে বর্ণিত অন্য সকল নীতি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বলে পরিগণিত হবে। এর ফলে ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানের রাষ্ট্রপরিচালনার ৪টি মূলনীতি পুনর্বহাল হয়।

৯. জাতীয়তাবাদ : ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত একক সত্তাবিশিষ্ট যে বাঙালি জাতি ঐক্যবদ্ধ ও সংকল্পবদ্ধ সংগ্রাম করে জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করেছেন সেই বাঙালি জাতির ঐক্য ও সংহতি হবে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি। ৩১

বাংলাদেশ সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১

১০. সমাজতন্ত্র ও শোষণমুক্তি: মানুষের উপর মানুষের শোষণ হতে মুক্ত ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজ লাভ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হবে।

১১. ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা: ধর্মনিরপেক্ষতা নীতি বাস্তবায়নের জন্য (ক) সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা, (খ) রাষ্ট্র কর্তৃক কোনো ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা দান, (গ) রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মীয় অপব্যবহার, (ঘ) কোনো বিশেষ ধর্ম পালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য বা তার উপর নিপীড়ন, বিলোপ করা হবে।

১২. পরিবেশ ও জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন: রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করবেন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীব-বৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্য প্রাণীর সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করবেন।

১৩. মহিলাদের সুযোগের সমতা নিশ্চিতকরণ: জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে'।

১৪. আদিবাসী, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি: রাষ্ট্র বিভিন্ন উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে'।

১৫. সংগঠনের স্বাধীনতা: জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে সমিতি বা সংগঠন করবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকবে; তবে শর্ত থাকে যে, কোনো ব্যক্তির উক্তরূপ সমিতি বা সংঘ গঠন করবার কিংবা এর সদস্য হবার অধিকার থাকবে না, যদি-(ক) তা নাগরিকের মধ্যে ধর্মীয়, সামাজিক এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করবার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়;

(খ) তা ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ, জন্মস্থান বা ভাষার ক্ষেত্রে নাগরিকদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করবার উদ্দেশ্যে গঠিত

(গ) তা' রাষ্ট্র বা নাগরিকদের বিরুদ্ধে কিংবা অন্য কোনো দেশের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী বা জঙ্গি কাজ পরিচালনার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়; বা

(ঘ) তার গঠন ও উদ্দেশ্য এই সংবিধানের পরিপন্থী হয়।

বাংলাদেশ সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১

১৬. ক্ষতিপূরণ প্রদান: এ অনুচ্ছেদের (১) দফার অধীন প্রণীত আইনে ক্ষতিপূরণসহ বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্তকরণ বা দখলের বিধান করা হবে এবং ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ কিংবা ক্ষতিপূরণ নির্ণয় ও প্রদানের নীতি ও পদ্ধতি নির্দিষ্ট করা হবে' অনুরূপ কোনো আইনে ক্ষতিপূরণের বিধানে অপর্যাপ্ত হয়েছে বলে সে আইন সম্পর্কে কোনো আদালতে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না।

১৭. মৌলিক অধিকার বলবৎকরণ: (১) মৌলিক অধিকারসমূহ বলবৎ করার জন্য হাইকোর্ট বিভাগের নিকট মামলা রুজু করবার অধিকারের নিশ্চয়তা দান করা হলো।

(২) হাইকোর্ট বিভাগের ক্ষমতাহানি না ঘটিয়ে সংসদ আইনের দ্বারা অন্য কোনো আদালতকে তার এখতিয়ারের স্থানীয় সীমার মধ্যে ঐ সকল বা এর যে কোনো ক্ষমতা দান করতে পারবেন।

১৮. নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিলুপ্তকরণ: উচ্চ আদালত 'ত্রয়োদশ সংশোধনী' আইনে প্রবর্তিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিলুপ্ত ঘোষণা করে। এজন্য পঞ্চদশ সংশোধনীতে সংবিধানের ২ক পরিচ্ছেদে উল্লেখিত 'নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা' বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয় এর ফলে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার স্থলে রাজনৈতিক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে (ক) মেয়াদ অবসানের কারণে সংসদ ভেঙ্গে যাবার ক্ষেত্রে ও ভেঙ্গে যাবার পূর্ববর্তী নব্বই দিনের মধ্যে; এবং (খ) মেয়াদ অবসান ব্যতীত অন্য কোনো কারণে সংসদ ভেঙ্গে যাবার পরবর্তী নব্বই দিনের মধ্যে।

বাংলাদেশ সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১

১৯. সর্বাধিনায়কতা: প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগসমূহের সর্বাধিনায়কতা রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত হবে এবং আইনের দ্বারা তার প্রয়োগ নিয়ন্ত্রিত হবে।

২০. জাতীয় সংসদে মহিলাদের আসন বৃদ্ধি: জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন সংখ্যা পয়তাল্লিশটির পরিবর্তে পঞ্চাশটি করা হয়।

যে, ২১. নাগরিকত্ব ও প্রজাতন্ত্রের লাভজনক পদ: জাতীয় সংসদে নির্বাচিত হবার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা প্রসঙ্গে বলা হয়

'(ঙ) তিনি ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ যোগসাজশকারী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশের অধীনে যে কোনো অপরাধের জন্য দণ্ডিত হয়ে থাকেন;

(চ) আইনের দ্বারা পদাধিকারীকে অযোগ্য ঘোষণা করছে না, এমন পদ ব্যতীত তিনি প্রজাতন্ত্রের কর্মে কোনো লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন; অথবা,

(২ক) এই অনুচ্ছেদের (২) দফার (গ) উপ-দফাতে যা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো ব্যক্তি জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক হয়ে কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করলে এবং পরবর্তীতে উক্ত ব্যক্তি- (ক) দ্বৈত নাগরিকত্ব গ্রহণের ক্ষেত্রে, বিদেশি রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ত্যাগ করলে; কিংবা

(খ) অন্য ক্ষেত্রে, পুনরায় বাংলাদেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করলে এ অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে তিনি বিদেশি রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করেছেন বলে গণ্য হবে না' এবং ...

(৩) এ অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে কোনো ব্যক্তি কেবল রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপ-মন্ত্রী হবার কারণে প্রজাতন্ত্রের কর্মে কোনো লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত বলে গণ্য হবেন না'।

২২. দলত্যাগ বা দলের বিপক্ষে ভোটদানের কারণে আসন শূন্য হওয়া: সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদে' বলা হয় যে, 'কোনো রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরূপে মনোনীত হয়ে কোনো ব্যক্তি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হলে তিনি যদি- (ক) উক্ত দল হতে পদত্যাগ করেন অথবা (খ) সংসদে উক্ত দলের বিপক্ষে ভোটদান করেন, তা হলে সংসদে তার আসন শূন্য হবে, তবে তিনি সে কারণে পরবর্তী কোনো নির্বাচনে সংসদ সদস্য হবার অযোগ্য হবেন না'।

২৩. বিলে রাষ্ট্রপতির সম্মতি: রাষ্ট্রপতির নিকট কোনো বিল পেশ করার পর পনর দিনের মধ্যে তিনি এতে সম্মতিদান করবেন কিংবা অর্থবিল ব্যতীত অন্য কোনো বিলের ক্ষেত্রে বিলটি বা তার কোনো বিশেষ বিধান পুনর্বিবেচনার কিংবা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্দেশিত কোনো সংশোধন বিবেচনার অনুরোধ জ্ঞাপন করে একটি বার্তাসহ তিনি বিলটি সংসদে ফেরত দিতে পারবেন; এবং রাষ্ট্রপতি তা করতে অসমর্থ হলে উক্ত মেয়াদের অবসানে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করেছেন বলে গণ্য হবে।

২৪. বিচারক নিয়োগে প্রধান বিচারপতির ক্ষমতা বৃদ্ধি: (১) প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবেন এবং প্রধান বিচারপতির সাথে পরামর্শ করে রাষ্ট্রপতি অন্যান্য বিচারককে নিয়োগদান করবেন।

বাংলাদেশ সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১

২৫. বিচারকদের পদের মেয়াদ ও সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিল: (১) এ অনুচ্ছেদের অন্যান্য বিধানাবলি সাপেক্ষে কোনো বিচারক সাতষট্টি বছর বয়স পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকবেন।

(২) এ অনুচ্ছেদের নিম্নরূপ বিধানাবলি অনুযায়ী ব্যতীত কোনো বিচারককে তার পদ হতে অপসারিত করা যাবে না।

(৩) একটি সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিল থাকবে যা এই অনুচ্ছেদে 'কাউন্সিল' বলে উল্লেখিত হবে এবং বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য বিচারকের মধ্যে পরবর্তী যে দুজন কর্মে প্রবীণ তাদের নিয়ে গঠিত হবে।

(৪) কাউন্সিলের দায়িত্ব হবে- (ক) বিচারকগণের জন্য পালনীয় আচরণ বিধি নির্ধারণ করা; এবং (খ) কোনো বিচারকের অথবা কোনো বিচারক যেরূপ পদ্ধতিতে অপসারিত হতে পারেন সেরূপ পদ্ধতি ব্যতীত তাঁর পদ হতে অপসারণযোগ্য নন এরূপ অন্য কোনো কর্মকর্তার সামর্থ্য বা আচরণ সম্পর্কে তদন্ত করা।

(৫) যে ক্ষেত্রে কাউন্সিল অথবা অন্য কোনো সূত্র হতে প্রাপ্ত তথ্যে রাষ্ট্রপতির এরূপ বুঝবার কারণ থাকে যে কোনো বিচারক- (ক) শারীরিক বা মানসিক অসামর্থ্যের কারণে তাঁর পদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে অযোগ্য হয়ে পড়তে পারেন, অথবা (খ) গুরুতর অসদাচরণের জন্য দোষী হতে পারেন; সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি কাউন্সিলকে বিষয়টি সম্পর্কে তদন্ত করতে ও তার তদন্ত ফল জ্ঞাপন করবার নির্দেশ দিতে পারেন।

(৬) কাউন্সিল তদন্ত করবার পর রাষ্ট্রপতির নিকট যদি এরূপ রিপোর্ট করেন যে, তার মতে উক্ত বিচারক তাঁর পদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনে অযোগ্য হয়ে পড়েছেন অথবা গুরুতর অসদাচরণের জন্য দোষী হয়েছেন তা' হলে রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা উক্ত বিচারককে তাঁর পদ হতে অপসারিত করবেন।

(৭) কোনো বিচারক রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ্য করে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদত্যাগ করতে পারবেন।

বাংলাদেশ সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১

২৬. সুপ্রিম কোর্টের আসন: রাজধানীতে সুপ্রিম কোর্টের স্থায়ী আসন থাকবে, তবে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন নিয়ে প্রধান বিচারপতি সময়ে সময়ে অন্য যে স্থান বা স্থানসমূহ নির্ধারণ করবেন, সেই স্থান বা স্থানসমূহে হাইকোর্ট বিভাগের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হতে পারবে।

২৭. দায়িত্ব অর্পণ এবং বেঞ্চ গঠন: কোন্ কোন্ বিচারককে নিয়ে কোন্ বিভাগের কোন্ বেঞ্চ গঠিত হবে এবং কোন্ কোন্ বিচারক কোন্ উদ্দেশ্যে আসন গ্রহণ করবেন, তা প্রধান বিচারপতি নির্ধারণ করবেন।

২৮. অধঃস্তন আদালতসমূহের নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা: বিচার-কর্মবিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিদের এবং বিচার বিভাগীয় দায়িত্ব পালনে রত ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়ন্ত্রণ (কর্মস্থল-নির্ধারণ, পদোন্নতিদান ও ছুটি মঞ্জুরীসহ) ও শৃঙ্খলা বিধান রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত থাকবে এবং সুপ্রিম কোর্টের সাথে পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক তা প্রযুক্ত হবে।

২৯. নির্বাচন কমিশনের সংখ্যা ও নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা বৃদ্ধি: নির্বাচন কমিশনারের সংখ্যা বৃদ্ধি করে অনধিক চারজন করা হয়।

বাংলাদেশ সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১

৩০. জাতীয় সংসদ সদস্য পদের যোগ্যতা: কোনো ব্যক্তি সংসদ সদস্য হবার উপযুক্ত হবেন, যদি-

'(গ) কোনো যোগ্য আদালত কর্তৃক তাঁর সম্পর্কে অপ্রকৃতিস্থ বলে ঘোষণা বহাল না থেকে থাকে;

(ঘ) তিনি ঐ নির্বাচনি এলাকার অধিবাসী বা আইনের দ্বারা ঐ নির্বাচনি এলাকার অধিবাসী বিবেচিত হন; এবং

(ঙ) তিনি ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ যোগসাজশকারী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশের অধীন কোনো অপরাধের জন্য দণ্ডিত না হয়ে থাকেন।'

বাংলাদেশ সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১

৩১. বিশেষ ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক দণ্ডিত ব্যক্তি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হবার অযোগ্য: কোনো ব্যক্তি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হবার এবং সংসদ সদস্য থাকবার যোগ্য হবেন না যদি- 'তিনি ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ যোগসাজশকারী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশের অধীন যে কোনো অপরাধের জন্য দণ্ডিত হয়ে থাকেন। ৫৩২. সংবিধানের বিধান সংশোধনের ক্ষমতা: 'এ সংবিধানে যা বলা হয়েছে, তা সত্ত্বেও

(ক) সংসদের আইন দ্বারা এ সংবিধানের কোনো বিধান সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন বা রহিতকরণের দ্বারা সংশোধিত হতে পারবে; তবে শর্ত থাকে যে,

(অ) অনুরূপ সংশোধনীর জন্য আনীত কোনো বিলের সম্পূর্ণ শিরোনামায় এ সংবিধানের কোন্ বিধান সংশোধন করা হবে বলে স্পষ্টরূপে উল্লেখ না থাকলে বিলটি বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা যাবে না;

(আ) সংসদের মোট সদস্য-সংখ্যা অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত না হলে অনুরূপ কোনো বিলে সম্মতিদানের জন্য তা রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত হবে না;

(খ) উপরিউক্ত উপায়ে কোনো বিল গৃহীত হবার পর সম্মতির জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট তা উপস্থাপিত হলে উপস্থাপনের সাত দিনের মধ্যে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করবেন এবং তিনি তা করতে অসমর্থ হলে উক্ত মেয়াদের অবসানে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করেছেন বলে গণ্য হবে।'

বাংলাদেশ সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১

৩৩. সংবিধান সংশোধনে 'গণভোট' ব্যবস্থা বাতিল: সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী আনয়ন করে 'গণভোট' ব্যবস্থা বাতিল করা হয়।

৩৪. অধ্যাদেশ প্রণয়ন ক্ষমতা: কোনো সময়ে (সংসদ ভেঙ্গে যাওয়া অবস্থায় অথবা অধিবেশনকাল ব্যতীত সময়ে) রাষ্ট্রপতির নিকট আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রয়েছে বলিয়া প্রতীয়মান হলে তিনি উক্ত পরিস্থিতিতে যেরূপ প্রয়োজনীয় বলে মনে করবেন, সেরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করতে পারবেন।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – বাংলাদেশের সংবিধান

টপিক – ১৯ বাংলাদেশ সংবিধান (ষোড়শ সংশোধন) আইন, ২০১৪

টপিক ১৯: বাংলাদেশ সংবিধান (ষোড়শ সংশোধন) আইন, ২০১৪

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

বাংলাদেশ সংবিধান (ষোড়শ সংশোধন) আইন, ২০১৪

২০১৪ সালের ১ আগস্ট মন্ত্রিসভায় 'সংবিধান (ষোড়শ সংশোধন) বিল' অনুমোদিত হওয়ার পর ২০১৪ সালের ৭সেপ্টেম্বর তা জাতীয় সংসদে উত্থাপন করেন আইনমন্ত্রী অ্যাডভোকেট আনিসুল হক। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সাতদিনের মধ্যে সংসদে প্রতিবেদন দেয়ার জন্য একই দিনে বিলটি আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে পাঠানো হয়। সংসদীয় কমিটি ৯ ও ১০ সেপ্টেম্বর দুটি বৈঠকে মিলিত হয়ে এ বিলটির প্রতিবেদন চূড়ান্ত করে। যাচাই-বাছাই শেষে ১৪ সেপ্টেম্বর কমিটির সভাপতি সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত স্থায়ী কমিটির রিপোর্ট উপস্থাপন করেন। স্পীকার শিরীন শারমীন চৌধুরীর সভাপতিত্বে জাতীয় সংসদের অধিবেশন শুরু হলে প্রধানমন্ত্রীর নির্ধারিত প্রশ্নোত্তর শেষে দিনের অন্যান্য কার্যসূচি স্থগিত করে ২০১৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর সংবিধানের 'ষোড়শ সংশোধনী বিল' দ্বিতীয়বার উত্থাপন করেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক। বিলটি সংসদে উত্থাপনের পর তা সর্বসম্মতক্রমে পাস হয়। বিলের পক্ষে ভোট পড়ে ৩২৭টি; বিপক্ষে কোনো ভোট পড়েনি। এর আগে বিলের দফা ও সংশোধনী প্রস্তাবের ওপর বিভক্তি ভোট হয়, যা ৩২৮-০ ভোটে পাস হয়। বিলটি জাতীয় সংসদে পাস হতে সময় লাগে মোট ৩ ঘণ্টা ৩১ মিনিট। ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৪ সংবিধানের ষোড়শ সংশোধন বিলে সম্মতি দেন রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ এডভোকেট। এরপর গেজেট প্রকাশের মাধ্যমে তা আইনে (Act) পরিণত হয়। এর ফলে ১৯৭২ সালে প্রণীত মূল সংবিধানের ৯৬ অনুচ্ছেদ পুনঃস্থাপিত হয় এবং বিচারপতিদের অপসারণের ক্ষমতা জাতীয় সংসদ ফিরে পায়।

বাংলাদেশ সংবিধান (ষোড়শ সংশোধন) আইন, ২০১৪

সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনীর বৈশিষ্ট্য

১. এই আইন 'সংবিধান (ষোড়শ সংশোধন) আইন, ২০১৪' নামে অভিহিত হবে।

২. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের '৯৬ অনুচ্ছেদের দফা (২), (৩), (৪), (৫), (৬), (৭) ও (৮)' এর পরিবর্তে 'নিম্নরূপ দফা (২), (৩) ও (৪)' প্রতিস্থাপিত হবে, যথা-

(২) প্রমাণিত অসদাচারণ বা অসামর্থ্যের কারণে সংসদের মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ গরিষ্ঠতার দ্বারা সমর্থিত সংসদের প্রস্তাবক্রমে প্রদত্ত রাষ্ট্রপতির আদেশ ব্যতীত কোনো বিচারককে অপসারিত করা যাবে না।

(৩) এই অনুচ্ছেদের (২) দফার অধীন প্রস্তাব সম্পর্কিত পদ্ধতি এবং কোনো বিচারকের অসদাচারণ বা অসামর্থ্য সম্পর্কে তদন্ত ও প্রমাণের পদ্ধতি সংসদ আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন।

(৪) কোনো বিচারক রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ্য করে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – বাংলাদেশের সংবিধান

টপিক – ২০ এক নজরে বাংলাদেশ সংবিধানের সংশোধনীসমূহ

এক নজরে বাংলাদেশ সংবিধানের সংশোধনীসমূহ

সংশোধনী আইনের শিরোনাম	সংশোধনী আইনের বিষয়বস্তু	উত্থাপনকারী	উত্থাপনের তারিখ	পাসের তারিখ	রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের তারিখ	পক্ষে-বিপক্ষে ভোট	মন্তব্য
সংবিধান (প্রথম সংশোধনী) আইন, ১৯৭৩	১৯৭১ সালের যুদ্ধাপরাধীসহ অন্যান্য মানবতাবিরোধী অপরাধীদের বিচার নিশ্চিতকরণ	আইনমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন	১২ জুলাই, ১৯৭৩	১৫ জুলাই, ১৯৭৩	১৭ জুলাই, ১৯৭৩	২৫৪-০ (বিরত ৩ জন)	***
সংবিধান (দ্বিতীয় সংশোধনী) আইন, ১৯৭৩	অভ্যন্তরীণ গোলযোগ বা বহিরাক্রমণে দেশের নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক জীবন বাধাগ্রস্ত হলে "জরুরি অবস্থা" ঘোষণার বিধান প্রণয়ন	আইনমন্ত্রী শ্রী মনোরঞ্জন ধর	১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩	২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩	২২ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩	২৬৭-০ (স্বতন্ত্র ও বিরোধী সদস্যগণ ওয়াকআউট করেন)	***
সংবিধান (তৃতীয় সংশোধনী) আইন, ১৯৭৪	বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত চুক্তি অনুমোদন এবং চুক্তি অনুযায়ী ছিটমহল ও অপদখলীয় জমি বিনিময় বিধান প্রণয়ন	আইনমন্ত্রী শ্রী মনোরঞ্জন ধর	২১ নভেম্বর, ১৯৭৪	২৩ নভেম্বর, ১৯৭৪	২৭ নভেম্বর, ১৯৭৪	২৬১-০৭	***

এক নজরে বাংলাদেশ সংবিধানের সংশোধনীসমূহ

সংবিধান (চতুর্থ সংশোধনী) আইন, ১৯৭৫	সংসদীয় শাসন পদ্ধতির পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন পদ্ধতি চালু এবং একদলীয় রাজনীতি প্রবর্তন	আইনমন্ত্রী শ্রী মনোরঞ্জন ধর	২৫ জানুয়ারি, ১৯৭৫	২৫ জানুয়ারি, ১৯৭৫	২৫ জানুয়ারি, ১৯৭৫	২৯৪-০	***
সংবিধান (পঞ্চম সংশোধনী) আইন, ১৯৭৯	১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের সামরিক অভ্যুত্থানের পর থেকে ১৯৭৯ সালের ৫ই এপ্রিল পর্যন্ত সামরিক সরকারের যাবতীয় কর্মকাণ্ডকে বৈধতা প্রদান	সংসদ নেতা শাহ আজিজুর রহমান	৪ এপ্রিল, ১৯৭৯	৫ এপ্রিল, ১৯৭৯	৬ এপ্রিল, ১৯৭৯	২৪১-০	সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক অবৈধ ঘোষিত এবং বাতিল কৃত
সংবিধান (ষষ্ঠ সংশোধনী) আইন, ১৯৮১	উপ-রাষ্ট্রপতি পদে বহাল থেকে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনের বিধান নিশ্চিতকরণ	সংসদ নেতা শাহ আজিজুর রহমান	১ জুলাই, ১৯৮১	৮ জুলাই, ১৯৮১	৯ জুলাই, ১৯৮১	২৫২-০	***

এক নজরে বাংলাদেশ সংবিধানের সংশোধনীসমূহ

সংবিধান (সপ্তম সংশোধনী) আইন, ১৯৮৬	১৯৮২ সালের ২৪শে মার্চ থেকে ১৯৮৬ সালের ৯ই নভেম্বর পর্যন্ত সামরিক আইন বলবৎ থাকাকালীন সময়ে প্রণীত সকল ফরমান, প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের আদেশ, নির্দেশ ও অধ্যাদেশসহ অন্যান্য সকল আইন অনুমোদন	আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী বিচারপতি কে এম নুরুল ইসলাম	১০ নভেম্বর, ১৯৮৬	১০ নভেম্বর, ১৯৮৬	১১ নভেম্বর, ১৯৮৬	২২৩-০	সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক অবৈধ ঘোষিত এবং বাতিল কৃত
সংবিধান (অষ্টম সংশোধনী) আইন, ১৯৮৮	প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ইসলামকে স্বীকৃতিদান। ঢাকার বাইরে ৬টি জেলায় হাইকোর্টের স্থায়ী বেঞ্চ স্থাপন। Dacca-এর নাম Dhaka এবং Bengali-এর নাম Bangla-তে পরিবর্তন।	সংসদ নেতা ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ	১১ মে, ১৯৮৮	৭ জুন, ১৯৮৮	৯ জুন, ১৯৮৮	২৫৪-০	***

এক নজরে বাংলাদেশ সংবিধানের সংশোধনীসমূহ

সংবিধান (নবম সংশোধনী) আইন, ১৯৮৯	একই সময়ে রাষ্ট্রপতি উপরাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন অনুষ্ঠান করা, রাষ্ট্রপতি পদে কোন ব্যক্তিকে পর পর দুই মেয়াদে সীমাবদ্ধকরণ।	সংসদ নেতা ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ	৬ জুলাই, ১৯৮৯	১০ জুলাই, ১৯৮৯	১১ জুলাই, ১৯৮৯	২৭২-০	***
সংবিধান (দশম সংশোধনী) আইন, ১৯৯০	কার্যকালের মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে ১৮০ দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ব্যাপারে সংবিধানের ১২৩(২) অনুচ্ছেদের বাংলা ভাষ্য সংশোধন ও সংসদে মহিলাদের ৩০টি আসন আরো ১০ বছরকালের জন্য সংরক্ষণ	আইন ও বিচারমন্ত্রী হাবিবুল ইসলাম	১০ জুন, ১৯৯০	১২ জুন, ১৯৯০	২৩ জুন, ১৯৯০	২২৬-০	***
সংবিধান (একাদশ সংশোধনী) আইন, ১৯৯১	অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের স্বপদে ফিরে যাবার বিধান প্রণয়ন।	আইন ও বিচারমন্ত্রী মীর্জা গোলাম হাফিজ	২ জুলাই, ১৯৯১	৬ আগস্ট, ১৯৯১	১০ আগস্ট, ১৯৯১	২৭৮-০	***

এক নজরে বাংলাদেশ সংবিধানের সংশোধনীসমূহ

সংবিধান (দ্বাদশ সংশোধনী) আইন, ১৯৯১	সংসদীয় পদ্ধতির সরকার পুনঃপ্রবর্তন ও উপরাষ্ট্রপতির পদ বিলুপ্তিকরণ	প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া	২ জুলাই, ১৯৯১	৬ আগস্ট, ১৯৯১	১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৯১	৩০৭-০	***
সংবিধান (ত্রয়োদশ সংশোধনী) আইন, ১৯৯৬	অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নিরপেক্ষ-নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন	আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী জমির উদ্দিন সরকার	২১ মার্চ, ১৯৯৬	২৭ মার্চ, ১৯৯৬	২৮ মার্চ, ১৯৯৬	২৬৮-০	সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক অবৈধ ঘোষিত এবং বাতিল কৃত

এক নজরে বাংলাদেশ সংবিধানের সংশোধনীসমূহ

সংবিধান (চতুর্দশ সংশোধনী) আইন, ২০০৪	মহিলাদের জন্য সংসদে ৪৫টি সংসদীয় আসন সংরক্ষণ, রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ছবি সংরক্ষণ, অর্থ বিল, সংসদ সদস্যদের শপথ, সাংবিধানিক বিভিন্ন পদের অধিকারীদের বয়স বৃদ্ধিকরণ।	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ	২৭ মার্চ, ২০০৪ দ্বিতীয়বার ২৮ এপ্রিল, ২০০৪	১৬ মে, ২০০৪	১৭ মে, ২০০৪	২২৬-১	***
সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধনী) আইন, ২০১১	সংবিধানের প্রস্তাবনা সংশোধন, ১৯৭২-এর মূলনীতি পুনর্বহাল, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিলুপ্তকরণ, ১/১১ পরবর্তী দ্বিতীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ম বহির্ভূতভাবে ৯০ দিনের অধিক ক্ষমতায় থাকার বিষয়টি প্রমার্জন, নারীদের জন্য সংসদে ৫০টি সংসদীয় আসন সংরক্ষণ।	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমদ	২৫ জুন, ২০১১	৩০ জুন, ২০১১	৩ জুলাই, ২০১১	২৯১-১	***

এক নজরে বাংলাদেশ সংবিধানের সংশোধনীসমূহ

সংবিধান (ষোড়শ সংশোধনী) আইন, ২০১৪	১৯৭২-এর সংবিধানের ৯৬ অনুচ্ছেদ পুনঃস্থাপনের মাধ্যমে বিচারপতিদের অপসারণের ক্ষমতা সংসদকে ফিরিয়ে দেয়া	আইনমন্ত্রী অ্যাডভোকেট আনিসুল হক	৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৪	১৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৪	২২ সেপ্টেম্বর, ২০১৪	৩২৮-০	***

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – বাংলাদেশের সংবিধান

টপিক – ২১ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

১।রাষ্ট্রের দর্পন হিসেবে অভিহিত করা হয় কোন্টিকে?[সি. বো. ২০২৩]

ক. প্রথা খ. বিচার বিভাগ গ. সংবিধান ঘ. আইন পাতাগ

২। পাকিস্তানি কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের মাটিতে ফিরে আসেন কত তারিখে? রা. বো. ২০২৩; য. বো. ২০১৬; ম. বো. ২০২১]

ক. ৯ জানুয়ারি ১৯৭২ খ. ১০ জানুয়ারি ১৯৭২

গ. ১১ জানুয়ারি ১৯৭২ ঘ. ১২ জানুয়ারি ১৯৭২

৩।কত তারিখে জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন?

[দি. বো. ২০২৩; ব. বো. ২০২১;

ক. ৪ জানুয়ারি, ১৯৭২ খ. ৮ জানুয়ারি, ১৯৭২

গ. ১০ জানুয়ারি, ১৯৭২ ঘ. ১১ জানুয়ারি, ১৯৭২

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য দ্রুত একটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এটির বাস্তবায়নও হয় খুব দ্রুত। [সি. বো. ২০২১]

উদ্দীপকে কোন্ বিষয়ের কথা বলা হয়েছে?

ক. আইন প্রণয়ন খ. সরকার গঠন গ. সংবিধান রচনা ঘ. মন্ত্রিপরিষদ গঠন

৫।কত তারিখে 'বাংলাদেশ গণপরিষদ আদেশ' জারি হয়? [ঢা. বো. ২০২৩; রা. বো. ২০২২; দি. বো. ২০২২]

ক. ২১ মার্চ ১৯৭২ খ. ২২ মার্চ ১৯৭২ গ. ২৩ মার্চ ১৯৭২ ঘ. ২৪ মার্চ ১৯৭২

৬।১৯৭২ সালে বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের জন্য অস্থায়ী সংবিধান আদেশ জারি করেন কে? [য. বো. ২০২২;

ক. ড. কামাল হোসেন খ. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

গ. স্পিকার শাহ আব্দুল হামিদ ঘ. তাজ উদ্দিন আহমেদ

৭।বাংলাদেশ সংবিধান প্রণয়নের পেছনে প্রথম পদক্ষেপ ছিল- ঢা. বো. ২০২৩]
ক. গণপরিষদ আদেশ জারি
খ. অস্থায়ী প্রতিনিধিত্বমূলক আদেশ জারি
গ. অস্থায়ী সংবিধান আদেশ জারি
ঘ. নাগরিক আদেশ জারি

৮।কোন্ পদ্ধতিতে বাংলাদেশের সংবিধান প্রণীত হয়? [কু. বো. ২০২২]
ক. রাষ্ট্রপতির আদেশবলে
খ. জাতীয় সংসদের মাধ্যমে
গ. বিপ্লবের মাধ্যমে
ঘ. গণপরিষদের মাধ্যমে

৯।বাংলাদেশ সংবিধান প্রণয়নে গঠিত কর্তৃপক্ষ কোন্টি? [কু. বো. ২০২১]
ক. মন্ত্রিপরিষদ
খ. গণপরিষদ
গ. মুজিবনগর সরকার
ঘ. সুপ্রিম কোর্ট

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১০ ও ১১নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

'Y' একটি সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত রাষ্ট্র। স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী রাজনৈতিক দল ক্ষমতা গ্রহণ করার পর রাষ্ট্রপতি এক আদেশ জারির মাধ্যমে রাষ্ট্রের নীতিমালা প্রণয়নের ঘোষণা দেন। এই উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠন করেন। কমিটি অল্প সময়ের মধ্যে একটি খসড়া নীতিমালা প্রণয়ন করেন।[চ. বো. ২০১৯]

১০ উদ্দীপকের সাথে কোন দেশের নীতিমালা প্রণয়নের মিল খুঁজে পাওয়া যায়?

ক. ভারত খ. বাংলাদেশ গ. ভুটান ঘ. পাকিস্তান

১১। উদ্দীপকে উল্লিখিত নীতিমালা প্রণয়নের ফলে-

i. নাগরিকের মৌলিক অধিকার প্রাপ্তি নিশ্চিত হয়

ii. গণতন্ত্র বিকাশের পথ সুগম হয়

iii. জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়

নিচের কোন্টি সঠিক?

ক. I খ. Ii গ. Iii ঘ. i, ii ও iii

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – বাংলাদেশের সংবিধান

টপিক – ২২ সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

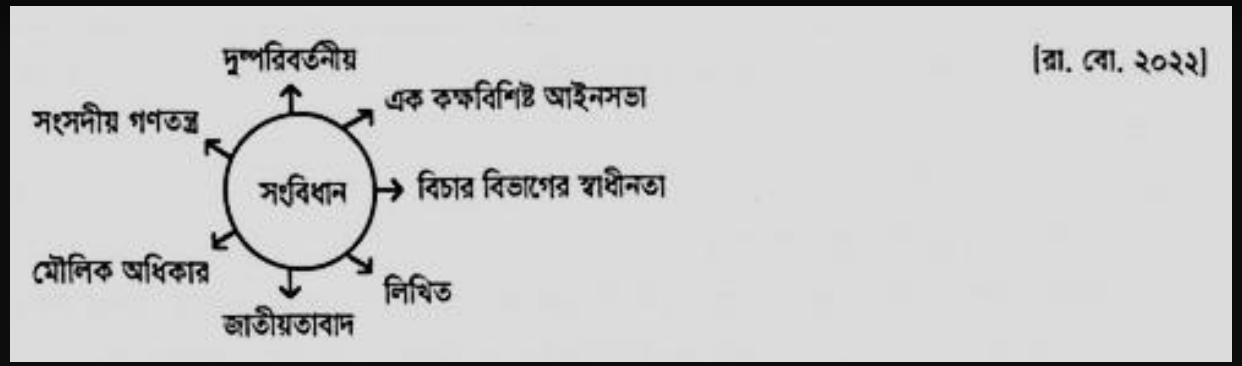

[রা. বো. ২০২২]

প্রশ্ন:

ক. দেশবন্ধু হিসাবে কে পরিচিত?

খ. এ. কে ফজলুল হককে কৃষককুলের মুক্তির দিশারি বলা হয় কেন?

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সংবিধানের সাথে পাঠ্যবইয়ের কোন দেশের সংবিধানের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত সংবিধানটি কি উত্তম সংবিধান? যুক্তি দাও।

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

জনাব কামরুল দ্বাদশ শ্রেণির ক্লাসে একটি দেশের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে বলেন,

"লিখিত সংবিধান, মৌলিক অধিকার, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি।"[য. বো. ২০২২]

প্রশ্ন:

ক. বাংলাদেশ সংবিধানে সর্বমোট কতটি সংশোধনী গৃহীত হয়েছে?

খ. সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান বলতে কী বোঝায়?

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংবিধানের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন সংবিধানের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উক্ত সংবিধানে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য ছাড়া আর কী কী বৈশিষ্ট্য আছে? বিশ্লেষণ করো।

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

একটি রক্তাক্ত সংগ্রামের পর 'X' রাষ্ট্রটি স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতা লাভের মাত্র এক বছরের মধ্যেই 'X' নামক রাষ্ট্রটি সংবিধান প্রণয়ন করতে সমর্থ হয়। এ সংবিধানটি পৃথিবীর অন্যতম সেরা সংবিধান যা বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হয়। এ সংবিধানে জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। [চ. বো. ২০২২]

প্রশ্ন:

ক. মুসলিম লীগ কত সালে গঠিত হয়?

খ. মৌলিক অধিকার বলতে কী বোঝায়?

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংবিধানটির সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের সংবিধানের সাদৃশ্য রয়েছে কি? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ সংবিধানটি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংবিধান-বিশ্লেষণ করো।

THANK YOU